বাঁধন-হারা

কাজী নজরুল ইসলাম

(ক)ত

করাচি সেনানিবাস,
২০এ জানুয়ারী (সন্ধ্যা)

ভাই রবু!

আমি নাকি মনের কথা খুলে' বলি নে ব'লে তুমি খুব অভিমান ক'রেছ? আর তাই এত দিন চিঠি-পত্তর লেখ নি? মনে থাকে যেন, আমি এই সুদূর সিন্ধুদেশে আরব-সিন্ধুর তীরে পড়ে' থাকলেও আমার কোন কথা জানতে বাকী থাকে না! সমঝে চলো, তারহীন বার্ত্তাবহ আমার হাতে!

আমি মনে ক'রেছিলাম,—সংসারী লোক, কাজের ঠেলায় বেচারীর চিঠি-পত্তর দেবার অবসর জোটে নি এবং কাজেই আর উচ্চ-বাচ্য কর্‌বার আবশ্যক মনে করে নি, কিন্তু এর মধ্যে তলে তলে যে এই কাণ্ড বেধে বসে' আছে, তা' এ বান্দার ফেরেশ্‌তাকেও খবর ছিল না! শ্রাদ্ধ এত দূর গড়াবে জান্‌লে আমি যে উঠোন পর্যন্ত নিকিয়ে রাখ্‌তাম!

আমি পল্টনের 'গোঁয়ার গোবিন্দ' লোক কিনা, তাই অত-শত আর বুঝতে পারি নি, কিন্তু এখন দেখছি তুমিও ডুবে ডুবে জল খেতে আরম্ভ ক'রেছ!

আমার আজ কেবলই গাইতে ইচ্ছে ক'রছে সেই গানটা, যেটা তুমি কেবলই ভাবী সাহেবকে (ওর্ফে ভবদীয় অর্দ্ধাঙ্গিনীকে) শুনিয়ে শুনিয়ে গাইতে—

'মান ক'রে থাকা আজকে কি সাজে?
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চল চল কুঞ্জ মাঝে।'

হাঁ,—ভাবি সাহেবাও আমায় আজ এই পনর দিন ধ'রে একেবারেই চিঠি দেন নি! স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী কিনা!

তোমার একখানা ছোট্ট চিঠি সেই এক মাস পূর্ব্বে—হাঁ, ত' প্রায় এক মাস হবে বৈ কি। পেয়ে তার পরের দিনই 'প্যারেড' যাওয়ার আগে এলোমেলো ভাবের কি কতগুলো ছাই-ভস্ম যে লিখে পাঠিয়েছিলাম, তা আমার এখন মনে নেই। সে দিন মেজাজটা বড় খাট্টা ছিল, কারণ সবেমাত্র 'ডিউটি' হ'তে 'রিলিং' হ'য়ে বা মুক্তি পেয়ে এসেছিলাম কিনা। তার পরেই আবার কয়েকজন পলাত

সৈনিককে ধরে' আনতে 'ডেরাগাজি খাঁ' বলে' একটা জায়গায় যেতে হয়েছিল! এসব হ-য-ব-র-ল'র মাঝে কি আর চিঠি লেখা হয় ভাই? তুমিই বা আর কিসে কম? এই একটা ছোট্ট ছুতো ধ'রে মৌনব্রত অবলম্বন করলে। এ মন্দ নয় দেখ্ছি?

তুমি যে মনুকে লিখে জানিয়েছো যে, আমি 'মিলিটারী লাইনে' এসে গোরাদেরই মত কাটখোট্টা হ'য়ে গেছি তাও আর আমার জানতে বাকী নেই। আগেই বলেছি, তারহীন বার্ত্তাবহ হে, ও সব তারহীন বার্ত্তাবহের সন্দেহ।

যখন আমায় কাটখোট্টা ব'লেই সাব্যস্ত ক'রেছ, তখন আমার হৃদয় যে নিতান্তই সজনে কাঠের ঠ্যাঙার মত শক্ত বা ভাঙা বাঁশের চোঙার মত খন্‌খনে নয়, তা' রীতিমত ভাবে প্রমাণ করতে হবে। বিলক্ষণ দূর না হ'লে আমি অবিশ্যি এতক্ষণ 'যুদ্ধং দেহি' বলে' আস্তীন গুটিয়ে দাঁড়াতাম; কিন্তু এত দূর থেকে তোমায় পাক্‌ড়াও ক'রে একটা 'ধোবী আছাড়" দেবার যখন কোনই সম্ভাবনা নেই, তখন মসীযুদ্ধই সমীচীন। অতএব আমি দশ হাত বুক ফুলিয়ে অসিমুক্ত মসীলিপ্ত হস্তে সদর্পে তোমায় যুদ্ধে আহ্বান করছি—'যুদ্ধং দেহি।

তোমার কথামত আমি কাটখোট্টা হ'য়ে যেতে পারি, কিন্তু এটা ত জান ভায়া, যে, খোট্টাকাঠের উপরও চোট প'ড়লে সেটা এমন আর্ত্তনাদপূর্ণ খং শব্দ ক'রে ওঠে, যেন ঠিক বুকের শুকানা হাড়ে কেউ একটা হাতুড়ির ঘা কসিয়ে দিলে আর কি! তোমার মত নবনীত-কোমল মাংসপিণ্ডসমষ্টি'র পক্ষে সেটার অনুভব একেবারে অসম্ভব না হ'লেও অনেকটা অসম্ভব বৈকি!

তা'ছাড়া সেটা জানবার জন্যে তোমার এত জেদ, এত অভিমান, তার ত অনেক কথাই জান। তার উপরেও আমার অন্তরের গভীরতর প্রদেশের অন্তরতম কথাটি জানতে চাও, পাকে-প্রকারে সেইটেই তুমি কেবলই জানাচ্ছো। —আচ্ছা ভাই ববু, আমি এখানে একটা কথা বলি, রেগো না যেন!

তোমার অভিমানের খাতির বেশী, না, আমার বুকের-পাঁজর দিয়ে-ঘেরা হৃদয়ের গভীরতম তলে নিহিত এক পবিত্র স্মৃতিকণার বাহিরে প্রকাশ ক'রে ফেলার অবমাননার ভয় বেশী, তা' আমি এখনো ঠিক ক'রে বুঝে উঠ্‌তে পারি নি। তুমিই আমায় জানিয়ে দাও ভাই কি করা উচিত!

আচ্ছা ভাই, যে শুক্তি আর কিছু চায় না, কেবল ছোট্ট একটি মুক্তা হৃদয়ের গোপন কোণে লুকিয়ে রেখে অতল সমুদ্রের তলে নিজকে তলিয়ে দিতে চায়, তাকে তুলে এনে তার বক্ষ চিরে সেই গোপন মুক্তাটা দেখবার এ কী মূঢ় অন্ধ আকাঙক্ষা তোমাদের! এ কী নির্দ্দয় কৌতূহল তোমাদের!

যাক্, শীগ্‌গির উত্তর দিয়ো। ভাবী সাহেবাকে চিঠি দিতে হুকুম করো, নতুবা ভাবী সাহেবাকে লিখবো তোমায় চিঠি দিতে হুকুম করবার জন্যে।

খুকীর কথা ফুটেছে কি? তাকে দেখবার বড় সাধ হয়।…সোফিয়ার বিয়ে সম্বন্ধে এখনও এমন উদাসীন থাকা কি উচিৎ? তুমি যেমন ভোলানাথ, মাও তথৈবচ। আমার এমন রাগ হয়!

আমার জন্যে চিন্তা ক'রো না। আমি দিব্যি কিষ্কিন্ধ্যার নবাবের মত আরামে আছি। আজকাল খুব বেশী প্যারেড ক'রতে হচ্ছে। দু'দিন পরেই আহুতি দিতে হবে কিনা। আমি পুনা থেকে বেয়নেট্ যুদ্ধ পাশ ক'রে এসেছি। এখন যদি তোমায় আমার এই শক্ত শক্ত মাংশ পেশীগুলো দেখাতে পারতাম!

দেখেছ, সামরিক বিভাগের কি সুন্দর চটক্ কাজ? এখানে কথায় কথায় প্রত্যেক কাজে হাবিলদারজিরা হাঁক্ পাড়ছেন, 'বিজ্‌লি কা মাফিক্ চটক্ হও! — সাবাস জোয়ান!

এখন আসি। 'রোল কল' এর অর্থাৎ কিনা হাজিরা দেবার সময় হ'ল। হাজিরা দিয়ে এসে বেল্ট ব্যাণ্ডোলিয়র্, বুট্, পট্টি (এ সব হ'চ্চে আমাদের রণসাজের নাম) দস্তুর মত সাফ্-সুতরো করে রাখতে হবে। কা'ল প্রাতে দশ মাইল 'রুট্' মার্চ্চ' বা পায়ে হণ্টন।—ইতি

তোমার কাঠখোট্টা লড়ুয়ে' দোস্ত্
নূরুল হুদা

করাচি সেনানিবাস
২১এ জানুয়ারী (প্রভাত)

মনু!

আজ করাচিটা এত সুন্দর বোধ হচ্ছে, সে আর কি ব'লব। কি হয়েছে, জানিস্?

কা'ল সমস্ত রাত্তির ধরে ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে খুব একটা দাপাদাপির পর এখানকার উলঙ্গ প্রকৃতিটা অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দিব্যি শান্ত স্থির বেশে — যেন লক্ষ্মী মেয়েটির মত ভিজে চুলগুলি পিঠের উপর এলিয়ে দিয়ে রোদ্দুরের দিকে পিঠ করে বসে আছে! এই মেয়েই যে একটু আগে ভৈরবী মুর্ত্তিতে সৃষ্টি ওলটপালট করবার জোগাড় ক'রেছিল, তা' তার এখনকার এ সরল শান্ত মুখশ্রী

দেখে কিছুতেই বোঝা যায় না। এখন সে দিব্যি তার আসমানী রং-এর ঢলঢলে চোক দুটি গোলাবী-নীল আকাশের পানে তুলে দিয়ে গম্ভীর উদাস চাউনিতে চেয়ে আছে। আর আর্দ্র ঋজুচুলগুলি বেয়ে এখনো দু-এক ফোঁটা ক'রে জল ঝ'রে প'ড়ছে আর নবোদিত অরুণের রক্তরাগের ছোঁয়ায় সেগুলি সুন্দরীর গালে অশ্রু বিন্দুর মত ঝিল্‌মিল্ ক'রে উঠ্‌ছে? কিন্তু যতই সুন্দর দেখাক, ভাই এই গম্ভীর সারল্য আর নিশ্চেষ্ট ঔদাস্য আমার কাছে এতই খাপ ছাড়া খাপ্‌ছাড়া ঠেকছে যে, আমি আর কিছুতেই হাসি চেপে রাখতে পারছি নে। বুঝতেই পারছ ব্যাপারটা; মেঘে মেঘে জটলা, তার ওপর হাড়-ফাটানো কন্‌কনে বাতাস; করাচি বুড়ি সমস্ত রাত্তির এই সমুদ্দুরেয় ধারে গাছপালাশূন্য ফাঁকা প্রান্তরটায় দাঁড়িয়ে থুরু-থুরু করে' কেঁপেছে, আর এখানকার এই শান্ত শিষ্ট মেয়েটিই তার মাথার ওপর বৃষ্টির পর বৃষ্টি ঢেলেছে। বজ্রের হুঙ্কার তুলে' বেচারীকে আরও শঙ্কিত ক'রে তুলেছে; বিজুরির তড়িতালোকে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে আর সঙ্গিনী উন্মাদিনী ঝঞ্ঝার সঙ্গে হো-হো করে' হেসেছে। তার পর সকালে উঠেই এই দিব্যি শান্ত শিষ্ট মুর্ত্তি, যেন কিছু জানেন না আর কি! বল্ ত ভাই এতে কার না হাসি পায়? এ একটা বেজায় বে-খাপ্‌পা রকমের অসমনঞ্জস্য কি না? আমার ঠিক এই প্রকৃতির দু-একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে। খুব একটা 'জাঁদরেলী' গোছের দাপাদাপি দৌরত্তির চোটে পাড়া মাথায় করে' তুলেছেন, হঠাৎ তাঁর মনে 'দার্শনিকের অন্যমনস্কতা' চলে' এল আর অমুনি এক লাফে তিনি তাঁর বয়সের আরও বিশ পচিশটা বৎসর ডিঙিয়ে একজন প্রকাণ্ড প্রৌঢ়া গৃহিণীর মত জলদ্‌গম্ভীর হ'য়ে বসলেন এবং কাজেই আমার মত 'ঠোঁট-কাটা ছ্যাব্‌লা'র পক্ষে তা নিতান্তই সমালোচনার বিষয় হ'য়ে ওঠে। সে রকম ধিঙি মেয়েদের বিপক্ষে আমি আর অধিক বাক্যব্যয় ক'রতে সাহস করি নে; কারণ—এই বুঝ্‌লে কিনা—এখনও আমার 'শুভদৃষ্টি' হয় নি। ভবিতব্য বলা যায় না ভাই। কবি গেয়েছেন,—(মৎকর্ত্তৃক সংস্কৃত)—

"প্রেমের পিঠ পাতা ভুবনে,
কখন কে চড়ে, বসে কে জানে।

অতএব এইস্থানেই আমার সুন্দরীর-গুণ-কীর্ত্তনে 'ফুলষ্টপ্—পূর্ণচ্ছেদ!

আবার এই কাণ্ডজ্ঞানহীন গো-মুখ্যুর মত যা'-তা' প্রলাপ শুনে তোর চক্ষু হয় ত এতক্ষণ চড়ক গাছ হ'য়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তও হচ্ছিস্ দস্তুর মত—নয়?—হবারই কথা। আমার স্বভাবই এই। আমি এত বেশী আবল-তাবল বকি যে, লোকেও তাতে শুধু বিরক্ত হওয়া কেন, কথঞ্চিৎ শিষ্ট প্রয়োগেরই কথা।

যাক্ এখন ও-সব বাজে কথা। কি বল্‌ছিলাম? আজ প্রাতের আকাশটার শান্ত সজল চাউনি আমায় বড্ডো ব্যাকুল ক'রে তুলেছে। তার ওপর আমাদের দয়ালু নকীব (বিউগ্লার) শ্রীমান্ গুপীচন্দর এইমাত্র 'নো প্যারেড' (আজ আর প্যারেড নাই) বাজিয়ে গেল। সুতরাং হঠাৎ-পাওয়া একটা আনন্দের আতিশয্যে সব ব্যাকুলতা ছাপিয়ে প্রাণটা আজকাল আকাশের মত উদার হ'য়ে যাবার কথা! তাই গুপীকে আমার প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ দিলাম সব, একেবারে চার হাত-পা তুলে। সে আশীর্ব্বাদটা শুনবি? 'আশীর্ব্বাদং শিরশ্ছেদং বংশনাশং অষ্টাঙ্গে ধবল কুষ্ঠং পুড়ে মরং।' এ উৎকট আশীর্ব্বাদের জুলুমে বেচারা গুপী তার 'শিঙ্গে' (বিউগ্‌ল) ফেলে ভোঁ দৌড় দিয়েছে। বেড়ে আমোদে থাকা গেছে কিন্তু ভাই।

এমনি একটা আনন্দ পাওয়ার আনন্দ পাওয়া যেত যখন বৃষ্টি হওয়ার জন্য হঠাৎ আমাদের স্কুল বন্ধ হ'য়ে যেত। স্কুল-প্রাঙ্গণে ছেলেদের উচ্চ হো-হো রোল রাস্তায় জলের সঙ্গে মাতামাতি ক'রতে করতে বোডিং-এর দিকে সংঘাতিক রকমের দৌড়, সেখানে গিয়ে বোডিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মুখের ওপর-এমন 'বাদল দিনে' ভুনি-খিঁচুড়ী ও কোর্ম্মার সারবত্তা এবং উপকারিতা সম্বন্ধে কোমর বেঁধে অকাট্য যুক্তিতর্ক প্রদর্শন, অনর্থক অনাবিল অট্টহাসি,—আহা সে কি)আনন্দের দিনই না চলে গেছে! জগতের কোন কিছুরই বিনিময়ে আমাদের মধুর হারানো দিনগুলি আর ফিরে আসবে না। ছাত্র-জীবনের মত যে মধুর জীবন আর নেই এ কথাটা বিশেষ ক'রে বোঝা যায় তখন, যখন ছাত্রজীবন অতীত হ'য়ে যায়, আর তার মধুর ব্যথাভরা স্মৃতিটা একদিন হঠাৎ অশান্ত জীবনযাপনের মাঝে ঝক-ঝক করে ওঠে।

আজ ভোর হ'তেই আমার পাশের ঘরে (কোয়ার্টারে) যেন গানের ফোয়ারা খুলে গেছে, মেঘমল্লার রাগিণীর যত গান জমা আছে 'ষ্টকে', কেউ আজ গাইতে কসুর ক'রছেন না। কেউ ওস্তাদী কায়দায় ধ'রছেন,—"আজ বাদার বরিখেরে ঝম্ ঝম্।" কেউ কালোয়াতী চা'লে গাচ্চেন, "বধু এমন বাদরে তুমি কোথা।' —এ উল্টো দেশে মাঘ মাসে বর্ষা, আর এটা যে নিশ্চয়ই মাঘ মাস, ভরা ভাদর নয়,—তা জেনেও একজন আবার কবাটি খেলার 'চু' ধরার সুরে গেয়ে যাচ্ছেন, —"এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।" সকলের শেষে গম্ভীর মধুর কণ্ঠ হাবিলদার পাণ্ডে মশাই গান ধ'রলেন,—"হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে, সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।" গানটা সহসা আমার কোন্ সুপ্ত ঘায়ে যেন বেদনার মত গিয়ে বাজলো। হাবিলদার সাহেবের কোন সজল-কাজল-আঁখি

প্রেয়সী আছেন কিনা, এবং আজকার এই 'শ্যামল ঘন নীল গগন,-দেখেই তাঁর সেইরূপ এক জোড়া আঁখি মনে প'ড়ে গেছে কিনা, তা' আমি ঠিক বলতে পারিনে, তবে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যেন আমারই হৃদয়ের লুকানো সুপ্ত কথাগুলি ঐ গানের ভাষা দিয়ে এই বাদল রাগিণীর সুরের বেদনায় গ'লে প'ড়ছিল। আমি অবাক্ হ'য়ে শুনতে লাগলাম,—

"হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে ।।
অধর করুণা-মাখা,
মিনতি বেদনা-আঁকা,
নীরবে চাহিয়া থাকা
বিদায় খনে,
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে ।।

ঝর্ ঝর্ ঝরে জল বিজুলি হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে ।
আমার পরাণপুটে
কোন্ খানে ব্যথা ফুটে,
কার কথা বেজে উঠে
হৃদয়-কোণে,
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে ।।"

গান হ'চ্ছে সঙ্গে সঙ্গে দু-চার জন সমঝদার টেবিল বই, খাটিয়া যে যা পেয়েছেন সামনে, তাই তালে-বেতালে অবিশ্রান্ত পিটিয়ে চলেছেন। এক একজন যেন মূর্তিমান্ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। আবার দু-একজন বেশী রকমের রসজ্ঞ ভাবে বিভোর হ'য়ে গোপাল রায়ের অনুকরণে—'দাদা গাই দেখ্‌সে, গরু তার কি দেখবো—দ্যাখ ঠাকুর্দার বিয়ে, ধুচনী মাথায় দিয়ে,—বাবারে, প্যাট গ্যালরে, শা...তোর কি হোলো রে,' ইত্যাদি সুমধুর বুলি অবিরাম আওড়িয়ে চ'লেছেন। যত না বুলি চ'লেছে মাথা-হাত-পা-মুখ নড়ছে তার চেয়ে অস্বাভাবিক রকমের বেশী। গানটা ক্রমে "অ্যাঙ্কোর প্লীজ"—"ফিন্ জুড়ো" প্রভৃতির খাতিরে দু-তিনবার গীত হ'ল। তার পর যেই এসে সমের মাথায় ঘা পড়েছে অমনি চিত্র বিচিত্র কণ্ঠের সীমা ছাড়িয়ে একটা বিকট ধ্বনি উঠ্‌ল, "দাও গরুর গা ধুইয়ে!—তোমার ছেলের বাপ ম'রে যাক্ ভাই! তুই মরলে আর বাঁচ্‌বি নে বাবা।" সঙ্গে সঙ্গে বুট-পটি পরা পায়ে বীভৎস তাণ্ডব নৃত্য!—

এদের এ উৎকট সমঝ-বুদ্ধিতে গানটার অনেক মাধুর্য নষ্ট হ'য়ে গেলেও মনে হ'চ্ছে এও যেন আমাদের আর একটা ছাত্রজীবন। একটা অখণ্ড বিরাট আমোদ এখানে সর্ব্বদাই নেচে বেড়াচ্ছে। যারা কাল মরবে তাদের মুখে এত প্রাণ-ভরা হাসি বড্ডো অকরুণ!

আমার কাণে এখনও বাজ্‌ছে—

"—পড়িল মনে
অধর করুণা-মাখা,
মিনতি বেদনা আঁকা,
নীরবে চাহিয়া থাকা
বিদায় ক্ষণে।"

আর তাই আমার এ পরাণপুটে কোন্ খানে ব্যথা ফুট্‌চে, আর হৃদয় কোণে কার কথা বেজে উঠ্‌ছে।

আমি আমার নির্জ্জন কক্ষটিতে ব'সে কেবলই ভাবচি যে, কার এ "বিপুল বাণী এমন ব্যাকুল সুরে" বাজচে, যাতে আমার মত শত শত হতভাগার প্রাণের কথা, হৃদয়ের ব্যথা এমন মর্ম্মন্তুদ হ'য়ে চোখের সামনে মুর্ত্তি ধ'রে ভেসে ওঠে? ওগো, কে সে কবিশ্রেষ্ঠ, যাঁর দুটি কথার আঁচড়ে এমন ক'রে বিশ্বের বুকের সুষুপ্ত ব্যথা চেতনা পেয়ে উঠে? বিস্মৃতির অন্ধকার হতে টেনে এনে প্রাণ-প্রিয়তমের নিদারুণ করুণ স্মৃতিটি হৃদয়ের পরতে পরতে আগুনের আঁখরে লিখে রেখে যায়? আধ-ভোলা-আধ-মনে-রাখা সেই পুরাণো অনুরাগের শরমজড়িত রক্ত-রাগটুকু চির নবীন করে দিয়ে যায়? কে গো সে কে?—তাঁর এ বিপুলবাণী বিশ্ব ছাপিয়ে যাক, সুরের সুরধুনী তাঁর জগতময় ব'য়ে যাক!—তাঁর চরণারবিন্দে কোটি কোটি নমস্কার!

'বিদায় ক্ষণের' নীরবে চেয়ে থাকার স্মৃতিটা আমার সারা হৃৎপিণ্ডটায় এমন একটা নাড়া দিলে যে, বত্রিশ নাড়ী পাক দিয়ে আমারও আঁখি সজল হয়ে উঠেছে! ভাই মনু, আজ আমায় পুরোনো দিনের সেই নিঠুর স্মৃতি বড্ডো ব্যথিয়ে তুলেছে! বোধ হয় আবার ঝর্ ঝর্ করেই জল ঝরবে। এ আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা ধরবার কোথাও ঠাঁই নেই!

খুব ঘোর ক'রে পাহাড়ের আড়াল থেকে একটা কালো মেঘ আবার আকাশ ছেয়ে ফেললে। আর কাগজটা দেখতে পাচ্ছি নে, সব যেন ঝাপ্‌সা হ'য়ে যাচ্ছে।

*　　　　*　　　　*　　　　*

(বিকেল বেলা)

হাঁ, এইবার চিঠিটা শেষ ক'রে ফেলি। সকালে খানিকক্ষণ গান ক'রে বিকেল বেলা এখন মনটা বেশ হাল্‌কা মত লাগছে।

চিঠিটা একটু লম্বা চওড়া হয়ে গেল। কি করি, আমার লিখতে বসলে কেবলই ইচ্ছা হয় যে, হৃদয়ের সমস্ত কথাই, যা হয় ত বলতে সঙ্কোচ আসবে, অকপটে লিখে যাই। কিন্তু সবটা পারি কই? আমার সবই আবছায়ার মত জীবনটাই আমার অস্পষ্টতায় ঘেরা।

রবিয়লকে চিঠি লিখেছি কাল সন্ধ্যায়। বেশ দু-একটা খোঁচা দিয়েছি। রবিয়ল অসঙ্কোচে আমারওপর ঘনিষ্ট বন্ধুত্বের যে রকম দাবী করে, আমি কিছুতেই তেমনটি পারি না। কি জানি কেন, তার ওপর স্বতঃই আমার ভক্তিমিশ্রিত কেমন একটা সঙ্কোচের ভাব আসে। তবুও সে ব্যথা পাবে বলে আমি নিতান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতই তার সঙ্গে চিঠিপত্তর ব্যবহার করি। কথাটা কি জান? সে একটু মুরুব্বি ধরণের, কেমন রাশ-ভারী লোক, তাতে পুরোদস্তুর সংসারী হয়ে পড়েছে। এরূপ লোকের সঙ্গে আমাদের মত ছাল-পাৎলা লোকের মোটেই মিশ খায় না। কিন্তু ও আর আমি যখন বাঁকুড়া কলেজিয়েট স্কুলে প'ড়তাম, তখন ত এমন ছিল না!

লোকটার কিন্তু একটা গুণ, লোকটা বেজায় সোজা! এই রবিয়ল না থাকলে বোধহয় আমার জীবন স্রোত কোন অচেনা অন্য দিকে প্রবাহিত হত! রবু আমার একাধারে প্রাণপ্রিয়তম বন্ধু ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার মতই দেখে। রবিয়লের চেয়েও সুন্দর স্নেহ আমি কখনও ভুল্‌বো না।

সংসারে কেউ না থাকিলেও রবিয়লদের বাড়ীর কথা মনে হ'লে মনে হয় যেন আমার ভাই বোন মা সবই আছে।

রবিয়লের স্নেহময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী জননীর কথা মনে হ'লে আমার মাতৃবিচ্ছেদ ক্ষতটা নতুন করে জেগে ওঠে।—আমি কিন্তু বড্ডো অকৃতজ্ঞ! না?

এখন আসি ভাই,—বড্ডো মন খারাপ কচ্চে। ইতি—

হতভাগা—

নূরুল হুদা

(খ)

সালার
২৯শে জানুয়ারী
(প্রভাত,—চায়ের টেবিল সন্মুখে)

নুরু !

তোর চিঠিটা আমার ভোজপুরী দারোয়ান ম'শায়ের 'থ্রু' দিয়ে কাল সান্ধ্য-চায়ের টেবিলে ক্লান্ত করুণ-বেশে এসে হাজির। দেখি, রিডাইরেক্টের ধস্তাধস্তিতে বেচারার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেছে। আমি ক্ষিপ্রহস্তে সেই চক্রলাঞ্ছিত, ওষ্ঠাগতপ্রাণ, প্রভুভক্ত লিপিবরের বক্ষ চিরে তার লিপিলীলার অবসান ক'রে দিলাম।—বেজায় উষ্ণমস্তিস্ক চায়ের কাপ্ তখন আমার পানে রোষকষায়িত লোচনে চেয়ে চেয়ে ধুম্র উদগীরণ করতে লাগলো। খুব ধৈর্য্যের সঙ্গে তোর লিপিচাতুর্য্য—যাকে আমরা মোটকথায় বাগাড়ম্বর বলি—দেখে খানিকটা ঠাণ্ডা দুধ-ঢেলে আগে চায়ের ক্রোধ নিবারণ করলাম। তারপর দু'চামচ চিনির আমেজ দিতেই এমন বদ্‌রাগী চায়ের কাপটাও দিব্যি দুধে আলতায় রঙীন হ'য়ে শান্ত মধুর রূপে আমার চুম্বন প্রয়াসী হ'য়ে উঠলো। তুই শুনে ভয়ানক আশ্চার্য হবি যে, তোর, কোঁদুলে' 'চামুণ্ডা' রণরঙ্গিণী ভাবী সাহেবা 'তত্রস্থানে' সশরীরে বর্ত্তমান থাকা সত্বেও (অবিশ্যি, তখন গুম্ফশ্মশ্রুবহুল বিশাল লাঠিস্কন্ধে ভোজপুরী মশাই ছিলেন না সেখানে) এবং তাঁর মৌরসী স্বত্ত্ব বেমালুম বেদখল হচ্ছে দেখেও তিনি কোন আপীল পেশ করেন নি।

আহা হা ! তাঁর মত স্বামীসুখাভিলাষিণী, 'উস্তট ত্যাগিনী' এ ঘোর কলিকালে মরজগতে নিতান্তই দুর্লভ রে, নিতান্তই দুর্লভ। আশা করি মৎকর্তৃক তোর শ্রদ্ধেয়া ভাবী সাহেবার এই গুণকীর্ত্তন (কোঁদুলে রণরঙ্গিণী আর চামুণ্ডা এই কথা কটি বাদ দিয়ে কিন্তু !) তোর পত্র মারফতে তাঁয় গোচরীভুত হ'তে বাকী থাকবে না !

আমাদের খুকীর বেশ দু একটি ক'রে কথা ফুটছে।—এই দ্যাখ্ সে এসে তোর চিঠিটার হাঁ-ক'রে থাকা ক্লান্ত খামের মুখে চাম্‌চা চামচা চা-ঢেলে তায় তৃষ্ণা নিবারণ ক'রছে, আর বলছে 'চা—পিয়াচ !'—সে তোর ঐ রণসাজ পরা খেজুর

গাছের মত ফটোটা দেখে চা—চা ক'রে ছুটে যায়, আবার দু'এক সময় ভয়ে পিছিয়ে আসে। এই খুদে মেয়েটা সংসারের সঙ্গে আমায় পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে ফেলেছে। শুধু কি তাই? এ 'আর্কালাতুন' মেয়ের জুলুমে মায়েরও পরমার্থচিন্তা অনেক কমাতে হয়েছে। আর সোফিয়ার ত সে জান! মাকে সে দিন এই নিয়ে ঠাট্টা করাতে, মা বল্লেন, "বাবা, মূলের চেয়ে সুদ পিয়ারা! এখন ঠাট্টা করছিস, পরে বুঝবি, যখন তোর নাতি-পুতি হবে।"—মার নমাজ পড়ার ত সে ঘোর বিরোধী। মা যখন নমাজ প'ড়বার সময় 'সেজ্‌দা যান, সে তখন হয় মায়ের ঘাড়ে চড়ে' বসে' থাকে, নতুবা তাঁর 'সেজ্‌দার' জায়গায় বসে 'দা—দা' ক'রে এমন করুণভাবে কাঁদ্‌তে থাকে যে, মায়ের আর তখনকার মত নমাজই হয় না! আবার মায়ের দেখাদেখি সেও খুব গম্ভীরভাবে নমাজ পড়ার মত মায়ের সঙ্গে ওঠে আর বসে! তা দেখে আমার ত আর হাসি থামে না। এই এক রত্তি মেয়েটা যেন একটা পাকা মুরুব্বি! ঝিদের অনুকরণে সে আবার হাতমুখ খিঁচিয়ে মায়ের সাথে 'কেজিয়া কর্‌তে শিখেছে। দুষ্টু ঝিগুলোই বোধ হয় শিখিয়ে দিয়েছে,—খুকি কেজিয়ার সময় মা'কে হাত নেড়ে বলে, "দুঃ! ছতিন্‌!—ছালা—ছতিন্‌!"

তোকে অনেক কথাই জানাতে হবে। কাজেই চিঠিটা হয় ত তোরই মত 'বক্তিমে'য় ভরা বলে বোধ হবে। অতএব একটু মাথা ঠাণ্ডা করে পড়িস। আমরা হচ্চি সংসারী লোক, সব সময়, সময় পাই না। আবার সময় পেলেও চিঠি লেখার মত একটা শক্ত কাজে হাত দিতে ইচ্ছে হয় না। তা'তে আমার ধা'ত তো তোর জানা আছে,—যখন লিখি তখন খুবই লিখি, আবার যখন লিখি নে তখন একেবারেই গুম্‌। তুই আমার অভিমানের কথা লিখেছিস, কিন্তু ঐ মেয়েলী জিনিসটার সঙ্গে আমার বিলকুল পরিচয় নেই। আর তারহীন বার্ত্তাবহের সন্দেশ বলে বেশী লাফালাফি কর্‌তে হবে না তোকে, ও সন্দেশ-ওয়ালার নাম আমি চোখ বুজে বলে দিতে পারি। তিনি হচ্ছেন, আমার সহধর্ম্মিণীর সহোদর শ্রীমান্ মনুয়র্। দেখেছিস্ আমার কত বেশী কেরামতী। তুই হচ্ছিস একটি নীরেট আহাম্মক, তা না হ'লে ওর কথায় বিশ্বাস করিস্? হাঁ, তবে এক দিন কথায় কথায় তোকে কাঠখোট্টা ব'লে ফেলেছিলাম বটে, কিন্তু এখনকার লেখার জোর দেখে আমার বাস্তবিকই অনুশোচনা হচ্চে যে, তোকে ও-রকম বলা ভয়ানক অন্যায় হ'য়ে গেছে! এখন আমার ইচ্ছে হচ্চে, তোর ঘাড়ে কিছু ভয়ানক রকমের উপাধিব্যাধি চড়িয়ে দি' কিন্তু নানান্ ঝঞ্ঝাটে আমার বুদ্ধিটা আজ মগজে এমন সংঘাতিক রকমে দৌড়ে বেড়াচ্ছে যে, তার লাগামটি কসে' ধরবারও জো'টি নেই! ...

এই হ'য়েছে রে,—হ'—য়ে—ছে' ! —ইতিমধ্যে পাশের ঘরে মুড়ো ঝাঁটাহস্তে দুটো ঝি-এর মধ্যে একটা কোঁদল 'ফুল্ ফোর্সে' আরম্ভ হ'য়ে গেছে।—বুঝেছিস্ এই মেয়েদের মত খারাপ জানোয়ার আর দুনিয়ায় নেই। এরা হচ্ছে পাতি-হাঁসের জাত। যেখানে দু'চারটে জুটবে, সেখানেই 'কচর্ কচর্ বকর বকর্ লাগিয়ে দেবে। এদের জ্বালায় ভাবুকের ভাবুকতা, কবির কল্পনা এমন করুণভাবে কর্পূরের মত উবে' যায় যে, বেচারীকে বাধ্য হ'য়ে তখন শান্তশিষ্ট ল্যাজবিশিষ্ট একটি বিশেষলম্বকর্ণ ভারবাহীরমতই নিশ্চেষ্ট ভ্যাবাকান্তহ'য়ে পড়তে হয়। গেরো গেরো ! দুত্তোর্ মেয়ে মানুষের কপালে আগুন ! এরা ঘর হ'তে আমায় উঠাবে তবে ছাড়্বে দেখ্ছি। অতএব আপততঃ চিঠি লেখা মুলতবী রাখ্তে হল ভাই। আমার ইচ্ছে হয়, এই মেয়েগুলোকে গরু-খেদা ক'রে দেখিয়ে তেপান্তরের মাঠে ঠেলে' উঠাই গিয়ে। ওঃ, সব গুলিয়ে দিলে আমার।

* * *

(দুপুর বেলা)—

বাপ্‌রে বাপ্। বাঁচা গেছে।—ঝি দুটোর মুখে ফেনা উঠে এইমাত্র তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। অতএব কিছুক্ষণের জন্য মাত্র সে ঝগড়াটা ধামাচাপা আছে। এই অবসরে আমিও চিঠিটা শেষ ক'রে ফেলি। নৈলে, ফের জেগে উঠে' ওরা যদি ধামাচাপা ঝগড়াটার জের চালায়, তা হ'লেই গেছি আর কি !

অনেক সময় হয় ত আমার কাজে কথায় একটু মুরব্বী ধরণের চা'ল অলক্ষিতেই এসে পড়ে। আর তোর মত চিরশিশু মনের তাতেই ঠেকে হোঁচট খেয়ে ভ্যাবা-চ্যাকা লেগে যায়, নয় ? কিন্তু আমার এদিন ছিল না, আমার মনে তোরই মত একটি চিরশিশু জাগ্রত ছিল রে, সে আজ বাঁধা পড়ে' তার সে সরল চঞ্চলতা আর আকুলতা ভুলে গিয়েছে। তাই বড় দুঃখে আমার সেই মনের বনের হরিণশিশু জলভরা চোখে আকাশের মুক্ত নীলিমায় চেয়ে দেখে, আর তার এই সোনার শিকলটায় করুণভাবে ঝঙ্কার দেয়···যাক্ ওসব কথা। তোকে একটা নীরস তত্ত্বকথা শুনাতে চাই এখানে, সেইটাই মন দিয়ে শোন্।—

মানুষ যত দিন, বিয়ে না করে, তত দিন তার থাকে দুটো পা। সে তখন স্বচ্ছন্দে যে কোন দ্বিপদ প্রাণীর মত হেঁটে বেড়াতে পারে, মুক্ত আকাশের মুক্ত পাখীর মত স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়াতেও পারে,—কিন্তু যেই সে বিয়ে করলে, অমনি হ'য়ে গেল, তার দু-জোড়া বা এক গণ্ডা পা। কাজেই সে তখন হ'য়ে গেল একটি চতুষ্পদ জন্তু। বেচারার তখন স্বাধীনভাবে বিচরণ করবার ক্ষমতা ত গেলই (কারণ চার-চারটে পা নিয়ে ত কোন জন্তুকে উড়তে দেখলাম না !)

অধিকন্তু সে হ'য়ে পড়ল একঠা স্থাবর-জমি-জমারই মত। একেবারে মাটির সঙ্গে 'জয়েন'। তারপর দৈবক্রমে যদি একটা সন্তান এসে জুটল, তা হ'লে হ'ল সে একটি ষট্‌পদ মক্ষিকা—সর্ব্বদাই আহরণে ব্যস্ত। আর একটি বংশবৃদ্ধি হলেই—অষ্টপদ পিপীলিকা; দিন নেই, রাত নেই ছোটো শুধু আহারের চেষ্টায়। তারপর, এই বংশবৃদ্ধি যখন বংশ-ঝাড়েরই মত চরম উন্নতি লাভ করল, অর্থাৎ কিনা নিতান্ত অর্ব্বাচীনের মতগিন্নী যখন এক বস্তা সন্তান প্রসব করে' ফেললেন, বেচারা পুরুষ তখন হ'য়ে গেল একেবারে বহুপদবিশিষ্ট একটি অলস কেন্নো! বেশ একটা হতাশ—নির্ব্বিকার ভাব! কোন বস্তু নেই—ছুঁলেই জড়সড়।

আমার এতদূর উন্নতি না হ'লেও যখন আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু হয়েছে রে ভাই, তখন কি আর একে আগোড় দিয়েও ঠেকানো যাবে। এ রকম অবস্থায় প'ড়লে যে সত্যি সত্যিই "সবারই মত বদলায়!"

তার পর, ছ্যাঁচা ঝিনুক! তুই যে অত ক'রে নিজেকে লুকিয়ে রাখ্‌তে চাস্ সমুদ্দর, না ডোবার ভিতরে, কিন্তু পারবি কি! আমি যে এঁটেল 'ল'টে-ছাঁচ্ছর' ডুবুরী! তুই পারস্যোপকূলের সমুদ্রের পাকে গিয়ে লুকালেও এ ডুবুরীর হাত এড়াতে পারবি নে, জেনে রাখিস। মাণিক কি কখনো লুকানো যায় রে আহাম্মক? খোশ'বুকে কি রুমাল চাপা রাখা যায়?...হায় কপাল, এই কুড়ি একুশ বছর বয়সে তোর-মত উদাসীনরা আবার সংসারের কি বুঝ্‌বে? শুধু কবির কল্পনায় তোরা সংসারকে ভালবাসিস্, এখানের যা কিছু ভাল, যা কিছু সুন্দর কেবল তাই তোদের স্বচ্ছ প্রাণে প্রতিফলিত হয়, তাই তোদের সঙ্গে আমাদের দুনিয়াদার লোকের কিছুতেই পুরোমাত্রায় খাপ্ খায় না। এক জায়গাতে একটু ফাঁক থাকবেই থাকবে, তা আমরা বাস্তব জগতের নিষ্ঠুর সত্য-গুলো আমাদের হাড়ে হাড়ে ভোগ করতে হয়। তোরা কল্পনারাজ্যের দেবশিশু, বনের চখা-হরিণ, আর আমরা বাস্তব জগতের রক্তমাংসে গড়া মান খাঁচার পাখী!—এইখানেই যে ভাই মস্ত আর আদত বৈষম্য।

কোন ফরাসী লেখক বলেছেন যে, খোদা মানুকে বাকশক্তি দিয়েছেন শুধু মনকে গোপন করার জন্যে। আর এ একেবারে নীরেট সত্য কথা। তাই আমার কেন মনে হচ্ছে যে তুই বাইরে এত সরল, এত উদার, এমন শিশু হ'য়েও যেন কোন্ এক বিপুল ঝঞ্ঝা' কি একটা প্রগাঢ় বেদনার প্রচ্ছন্ন বেগ অন্তরে নিয়তই চেপে রাখছিস—মানুষকে বোঝা যে বড্ডো শক্ত ব্যাপার তা জানি, কিন্তু মানুষ হয়ে মানুষের চোখে ধুলো দেওয়াও নেহাৎ সহজ নয়। তোদের মত লোককে চিনতে পারেন এক তিনিই, যিনি নিজের বুকে বেদনা পেয়েছেন, আর সেই

বেদনা দিয়ে যদি তিনি তোর বেদনা বুঝতে পারেন তবেই, তা না, হ'লে যত বড়ই মনস্তত্ত্ববিদ্ হন, এ রকম শক্ত জায়গায় তাঁরা ভয়ানকভাবে ঠকবেন। একটি প্রস্ফুটিত ফুলের হাসিতে যে কত কান্নাই লুকানো থাকে, তা কে বুঝবে? ফুলের ঐ শুভ্র বুকে যে ব্যথার কীটে কত দাগ কেটেছে, কে তা' জানতে চায়? আমরা উপভোগ করতে চাই ফুলের ঐ হাসিটি, ঐ উপরের সুরভিটুকু।

সত্য বলতে গেলে, আমি যতই বড়াই করি ভাই, কিন্তু তোকে বুঝে উঠতে পারলাম না। যখনই মনে করেছি, এই তোর মনের নাগাল পেয়েছি, অমনি তোর গতি এমন উল্টো দিকে ফিরে যায় যে, আমি নিজের বোকামীতে নিজেই না হেসে থাকতে পারি নে। এই তোর যুদ্ধে যাবার আগের কথাটাই ভেবে দেখনা!—আমার যেন এক দিন মনে হ'ল যে, সোফিয়ার সই মাহ্বুবাকে দেখে তুই মুগ্ধ হয়েছিস্। তাই বড় আনন্দে সে দিন গেয়েছিলাম "এবার সখি সোনার মৃগ দেয় বুঝি ধরা" এবং আমার মোটা বুদ্ধিতে সব বুঝেছি মনে ক'রে তার সঙ্গে তোর বিয়ের সব ঠিক-ঠাক করলাম, এমন সময় হঠাৎ একদিন তুই যুদ্ধে চলে গেলি। আমার ভুল ভাঙলো, অনেকের বুক ভাঙলো! সোনার শিকল দেখে পাখী মুগ্ধ হ'য়ে যেন কাছিয়ে এসেছিল, কিন্তু যেই জানলে ওতে বাঁধনের ভয় আছে, অম্নি সে সীমাহীন আকাশে উড়ে' গেল।

এইখানে আর একটা কথা বলি, কিন্তু তুই মনে করিস না যেন যে আমি নিজের সাফাই গাইছি। প্রথমে সত্য সত্যই তোর এ বিয়েতে আমার উৎসাহ ছিল না, যদিও কেউ ক্ষুণ্ন হবে বলে আমি এ কথাটা কাউকে তেমন জানাই নি। তার প্রধান কারণ, তুই কোথাও কোন ধরা-ছোঁওয়া দিস্ নি। আবার যেখানে ইচ্ছা ক'রে ধরা দিতে গিয়েছিস্, সেইখানেই কার নিষ্ঠুর হাত এসে তোকে আলাদা ক'রে দিয়েছে, মুক্ত ক'রে দিয়েছে! সে-কোন্ চপল যেন তোর খেলার সাথী! সে-কোন্ চঞ্চলের যেন তুই ছাড়া-হরিণ! তাই কোন বাঁধন তোকে বাঁধ্তে পারে না। কিন্তু এ-সব জেনেও এমন কিছু ঘটল, যাতে আমারও মনটা কেমন গোলমাল হ'য়ে গেল।—আমার মস্ত বিশ্বাস ছিল যে, পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই মানুষের মন বুঝিতে বেশী ওস্তাদ! কিন্তু এখন দেখছি সব ভুয়ো! কারণ তোর মাননীয়া ভাবী সাহেবাই আমায় কান-ভাঙানি দিয়েছিলেন এবং সাফ্ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তুই নাকি মাহ্বুবাকে দেখে-একেবারে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলি, এমন কি তুই নাকি আর তোর মধ্যেছিলি নে এবং মাহ্বুবাও নাকি তোর পায়ে একেবারে মনাপ্রাণ 'ডারি' দিয়েছিল। এমন দু-তর্ফা ভালবাসাকে মাঝ-মাঠে শুকোতে দেওয়া আমাদের মত নব্য-

শিক্ষিতদের পক্ষে এক রকম পাপ কিনা, তাই বড় খুশী হ'য়েই তোদের এ বুকের ভালবাসাকে সোনার সুতোয় গেঁথে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কাজের বেলায় হ'য়ে গেল যখন সব উল্টো তখন যত দোষ এই নন্দ ঘোষের ঘাড়েই হুড়মুড় ক'রে পড়ল! অবশ্য আমার একটু সব দিক ভেবে কাজ করা উচিত ছিল, কিন্তু যুবতীদের—আবার তিনি যদি ভার্য্যা হন, তবে ত কথাই নেই—এমন একটা মোহিনী শক্তি আছে, যা'তে মহা জাঁহাবাজ পুরুষেরও মন একেবারে গলে' মোম হ'য়ে যায়! তখনকার মত বেচারার আর আপত্তি করবার মত কোন শক্তিই থাকে না। সাধে কি আর জ্ঞানীরা বলেছেন যে, মেয়েরা আগুন, আর পুরুষ সব মোম,—কাছাকাছি হয়েছে কি গলেছে। আমি আমার ধৈর্য্যশীলতার জন্যে চিরপ্রসিদ্ধ কিনা তাই এখন যত মিথ্যা অপরাধের বোঝা-গুলোও নির্বিকার চিত্তে বইতে হচ্ছে। এক কথায়,—ঐ যে কি বলে,—আমি হচ্ছি "সাহেবের দাগা পাঠা!"

তার পর, আমি এখন ভাবচি যে; যে-যুদ্ধের মানুষ কাটাকাটির বিরুদ্ধে 'বঙ্কিমের' তোড়ে তুই সুরেনবাবুই রুটী মার্‌বার জোগাড় করেছিলি, মাঝে আবার জীবহত্যা মহাপাপ বলে স্রেফ্ শাকান্নভোজী নিরামিষ প্রাণী বা পরমহংস হয়ে পড়েছিলি, সেই তুই জানি নে কোন্ অনুপ্রেরণায় এই ভীম নরহত্যার যজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়লি! জানি নে সে কোন্ বজ্রবাঁশী তোকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিল, তোর এই বাঁধন-হারা প্রাণটিকে জননী জন্মভূমির পায়ে ফুলের মত উৎসর্গ ক'রে দিতে! তবে কি এটা তোর সেই বিপরীত স্বভাবটা, যেটা অন্যায়ের খোঁচা না খেলে জেগে উঠত না? অন্যায়কে রুখতে গিয়ে এক এক দিন তুই যে-রকম খুনোখুনি ব্যাপার বাধিয়ে তুলতিস্, তা-ত আর কারুর অবিদিত নেই! আমি এখনও ভাবি, সে সময় কি রকম প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠত একটা অমানুষিক শক্তিতে তোর ঐ অসুরের মত শক্ত শরীরটা। আসান-সোলে ম্যাচ্ খেলতে গিয়ে যেদিন একা এক প্রচণ্ড বংশদণ্ড দিয়ে প্রায় এক শত ইংরেজকে খেদিয়ে নিয়ে গিয়েছিলি, সেই দিনই বুঝেছিলাম তোর ঐ কোমল প্রাণের আড়ালে কত বড় একটা আগ্নেয় পর্ব্বত লুকিয়ে আছে, যেটা নিতান্ত উত্তেজিত না হ'লে অগ্ন্যুদ্গীরণ করে না।

বড় কৌতুহল হয়, আর জানাও দরকার, তাই তোর সমস্ত কথা জানতে চেয়েছিলাম। তা'তে যদি তোর কোন পবিত্র স্মৃতির অবমাননা হয় মনে করিস্ তবে আমি তা জানতে চাই নে। আমি সে রকম নরাধম নই। কিন্তু সে কোন্ ভাগ্যবতী রে, যে তোর এমন হাওয়ার প্রাণেও রেখা কেটে দিয়েছে? সে

কোন্ সুন্দরীর বীণের বেদন তোর মত চপল হরিণকে মুগ্ধ ক'রেছে? কেন তুই তবে এসব কথা কাউকে জানাস নি? তুই সত্য সত্যই একটা মস্ত প্রহেলিকা।

সোফিয়ার বিয়ে নিয়ে তোকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। তুই নিজের চরকায় তেল দে। তোর মত বিবাহ-বিদ্বেষী লোকের আবার পরের বিয়ের এত ভাবনা কেন? আমরা মনে করেছি, আর তোর ভাবীরও নিতান্ত ইচ্ছা যে, মনুয়রের সঙ্গে ওর বিয়ে দিই। তোর কি মত? তবে আরও দু'চার মাস দেরী করতে হবে। কেননা মনুর বি-এ পরীক্ষা দেবার সময় খুব নিকট। ওর পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেলেই শুভ কার্য্যটা শেষ ক'রে ফেলব মনে করচি। তুই সেই সময় ছুটি নিয়ে বাড়ি আস্তে পার্‌বি না কি? তুই না এলে যে ঘরের সব-কিছু কাঁদবে!

তোর সামনে সোফিয়া তোর খুব বদনাম করত আর তোর সঙ্গে কথায় কথায় ঝগড়া করত বটে, কিন্তু তুই যাবার পর হতেই তার মত আশ্চর্য্য রকমে বদলে গিয়েছে। সে এখন তোর এত বেশী প্রশংসা করতে আরম্ভ করেছে যে, আমি হিংসে না ক'রে থাকতে পারচি নে। তোর এই যুদ্ধে যাওয়াটাকে সে একটা মস্ত কাজের মত কাজ বলে ডঙ্কা পিটুচ্চে। তুই চলে' যাবার পর ওর যদি কান্না দেখতিস। সাত দিন সাত রাত না-খেয়ে না-দেয়ে সে শুধু কেঁদেছিল। এখনও তোর কথা উঠলেই তার চোখ ছল্‌ছল্ করে' উঠে।...সে তার হাতের বোনা কয়েকটা 'কম্ফর্টার' আর ফুলতোলা-রুমাল পাঠিয়েছে তোকে, বোধ হয় পেয়েছিস্! তোকে তোদের এই যুদ্ধের পোষাকে দেখ্‌বার জন্যে সে বড্ডো সাধ করেছে। এখনকার ফোটো থাকে ত পাঠাস্। যা টাকা-কড়ির দরকার হবে জানাস্। এখন আর কোন কষ্ট হয় না ত? এখানে সব এক রকম ভাল।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, তুই আমাকে নবনীত কোমল মাংস-পিণ্ড-সমষ্টি বলে' ঠাট্টা করেছিস, কিন্তু এখন এলে দেখ্‌তে পাবি, এই দু' বছরেই সংসার আর বিবি সাহেবার চাপে আমি শজ্‌নে কাঠের চেয়েও নীরস হ'য়ে প'ড়েছি। তোর উপরটা লোহার মত হ'লেও ভিতরটা ফুলের চেয়েও নরম! তুই বাস্তবিকই সুক্তি, উপরটা ঝিনুকের শক্ত খোসায় ঢাকা আর ভিতরে মাণিক। আর আমি হচ্ছি ঐ—শজ্‌নে কাঠের শুকনো ঠ্যাঙা—না-উপরটা মোলায়েম, না-ভিতরে আছে কিছু রস কস! একেবারে ভুয়ো—ভুয়ো! ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
হাড়গোড়-ভাঙা "দ"
রবিয়ল

বাবা নূর !

আমার স্নেহাআশীষ জানবে। মা'কে এরই মধ্যে ভুলে গেলে নিমকহারাম ছেলে ? আমাকে ভুলেও একটা চিঠি দেওয়া হল না এতদিনের মধ্যে ? আমি প্রথমে রেগে চিঠি দিই নি। যে ছেলে মায়ের নয়, তার ওপর দাবী দাওয়া কিসের ? ওরে' তোরা কি করে' মায়ের মন বুঝবি ? তা যদি বুঝতিস, তবে আর এমন করে' জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করতিস্ নে আমায়। নাই বা হ'লাম তোর গর্ভধারিণী জননী আমি, তবু যে আমি কোন দিন তোকে অন্যের বলে' স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। একটা কথা আছে, ''পেটে ধরার চেয়ে চোখে-ধরা বেশী লাগে।'' তোরা একথা বুঝতে পারবি নে।

আমি চিঠি লিখতাম না বা, তবে রবু সে দিন হাসতে হাসতে বললে, ''মা জান্ তুমিই ভাল ক'রে নূরুল কথাবার্ত্তায়, গল্পে যোগ দিতে না বলে' সে রেগে চলে' গিয়েছে।'' দেখেছিস্ কথার ছিরি ? 'ছিঁচে পানি' আর মিছে কথা মানুষের গায়ে বড্ড লাগে। তা কথাটা মিথ্যে হ'লেও আমার জানে এত লাগল —যেমন মায়ের দোষে ছেলে চলে' যাবার পর সেই ব্যথাটা মায়ের প্রাণে গিয়ে বাজে। জানি, তুই কখ্খনো সে রকম ভাবতে পারিস্ নে, তবু এইখানে কয়েকটা কথা জানিয়ে রাখি বাপ, কেননা 'হায়াত মওতে'র কোন ঠিক ঠিকানা নেই। আমার দিন ত এবার ঘনিয়েই আসচে। এক দিন এমন ঘুমিয়ে পড়'ব যে, তোরা ঘরগুষ্টি মিলে কেঁদেও আর জাগাতে পারবি নে। আহা খোদা তাই যেন করেন, তোদের কোন অমঙ্গল যেন আমায় আর দেখে যেতে না হয়। শোকে শোকে এ বুক ঝাঁজ্‌রা হ'য়ে গিয়েছে। তাই এখন খোদার কাছে চাইছি যেন তোর হাতের মাটি পেয়ে মর্‌তে পারি। আমার জান তোর ওখানেই পড়ে' আছে, কখন ছেলের কি হয়।

দু এক সময় তোর ছেলেমী আর ক্ষ্যাপামী দেখে খুবই বিরক্ত হতাম, কিন্তু ঐ বিরক্তির মধ্যে যে কত স্নেহ ভালবাসা লুকানো থাকতো, তোরা ছেলেমানুষ তা' বুঝতে পারবি নে। কিন্তু এ সব তুচ্ছ কথা কি এখনও তোর প্রানে জাগে ? মায়ে ছেলের যে কত আদর আবদার হয় বাপ !

অবিশ্যি আমার এও মনে পড়ে যে, তুই যখন অনবরত বক্‌র বক্‌র ক'রে আমাদের সংসারী লোকের পক্ষে নিতান্তই অস্বাভাবিক কথাগুলো বকে' যেতিস্ আর নিজের ভাবে নিজেই মশগুল হ'য়ে পড়তিস্, তখন আমি হয় ত বিরক্ত হয়ে উঠে অন্য কাজে যেতাম, তোর কিন্তু 'কথার ফোয়ারায় ফিং ফুটে' যেত। তোদের ছেলে-পিলের দলে কি আর আমাদের মত সেকেলে মুরুব্বিদের ব'সে থাকা

মানায় ?—রবু বলে কি, এই সবে তোর মনে বড্ডো কষ্ট হ'ত। সত্যি কি তাই ? রবুর মত বোকা ছেলে ত আর তুই নস্ যে এই সব বলে কয়ে' আমায় কষ্ট দিবি।

তোরা এই সব ছেলে-মেয়েগুলোই ত আমাদের দুষ্মন। মা'দের যে কত জ্বালায় জ্বল্‌তে হয়, কি চিন্তাতেই যে দিন কাটাতে হয়, তা যদি ছেলেরা বুঝতো তা হ'লে দুনিয়ার মা'রা ছেলেদের খামখেয়ালীর জন্য এত কষ্ট পেত না ! উঃ, হাড় কালি হ'য়ে গেল !

এখন দিনরাত খোদার কাছে মুনাজাত করছি, কখন তোকে আবার এ যমের মুখ থেকে সহিসালামতে ফিরিয়ে আনেন। কি পাগ্‌লামীই না করলি, একবার ভেবে দেখ্ দেখি !

খুব ভাল ক'রে থাকিস্। খাবার-দাবার খুব কষ্ট হ'চ্ছে বোধ হয় সেখানে ? আমাদের পোড়া মুখে যে আহার রুচে না ! খেতে গেলেই মনে হয়,—আহা, ছেলে আমার কোন বিদেশে হয় ত না-খেয়ে নাদেয়ে প'ড়ে আছে, আর আমি হতভাগী মা হ'য়ে ঘরে বসে' রাজভোগ গিল্‌ছি অমনি চোখের জলে হাতের ভাত ভেসে যায়।

জল্‌দি চিঠি দিস্ আর সেখানকার সব কথা জানাস্।

বাকী সব রবুর চিঠিতে জানবি। আর লিখতে পারচি নে। তোরা কেউ তোর চিঠি পড়ে' আমায় শুনায় না। নিজে কি যে ছাই পাশ লেখে দু, দিন ধরে', তাও জানায় না। আমার হাত কাঁপে তবু নিজেই লিখলাম চিঠিটা। কি করি বাবা, মন যে, বালাই, কিছুতেই মানে না। তা ছাড়া, আমিও মুরুখ্যুর মেয়ে নই। আমার বাবাজী (আল্লাহ তাঁকে জিন্নত্ নসীব করুন) মৌলবী মৌলানা লোক ছিলেন, তাঁর পায়ের এতটুকু ধুলো পেলে' তোরা বত্তিয়ে যেতিস...ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষিণী—
তোর মা

(গ)

বাঁকুড়া

২৪এ জানুয়ারী (বিকেল বেলা)

অথ নরম গরম পত্রমিদম্ কার্য্যনঞ্চাগে বিশেষ। বাঙালী পল্টনের তাল-পাতার সিপাই শ্রীল শ্রীযুক্ত নূরুল হুদা বরাবরেষু।...

বুঝ্‌লি নুরু। তোর চিঠি নিয়ে কিন্তু আমাদের বোর্ডিং-এর কাব্যি রোগা-ক্রান্ত যাবতীয় ছোকরাদের মধ্যে একটা বিরাট রকমের আলোচনা চলেছে! এঁদের সবাই ঠাউরেছেন, তুই একটা প্রকাণ্ড 'হবু-কবি' বা কবি-কিশলয়! তোর যে ভবিষ্যত দস্তুর মত 'ফর্সা' এবং ক্রমে তুই-ই যে রবি বাবুর "নোবেল প্রাইজ," কেড়ে না নিস্ অন্ততঃ তাঁর নাম রাখতে পারবি, এ সিদ্ধান্তে সকলেই একবাক্যে সম্মতিসূচক ভোট দিয়েছেন। তবে আমার ধারণা একটু বিভিন্ন রকমের। ভবিষ্যতে তুই কবিরূপে সাহিত্যমাঠে গজিয়ে উঠ্‌বি কিনা, তার এখনও নিশ্চয়তা নেই,—কিন্তু 'কপি হয়েই আছিস্। কেননা কবির চেয়ে কপির উপাদানই তোর মধ্যে বেশী।—আর ছোকরাদের ঐ হৈ-চৈ-এর সম্বন্ধে আমার বিশেষ তেমন বক্তব্য নেই, তবে, এইমাত্র বললেই যথেষ্ট হবে যে, উপরে হৈ হৈ ব্যাপার। রৈ রৈ কাণ্ড।।—জার্ম্মাণীর পরাজয়!!! লেখা থাকলেও ভিতরে সেই—ফসিউল্লার গোলাব নির্য্যাস, চারি আনা শিশি। নয়ত সিলেট চুণ।

তাই বলে' মনে করিস্ নে যেন যে, দেতো 'ক্রিটিকে'র মত ছোব্‌লে' তোকে আমি জখম্ ক'রে দিচ্ছি। আমিও আবার হুজুগে সমালোচকদের হম্লায় সায় দয়ে বলছি, কপালের দোষে নিতান্তই যদি তুই সাহিত্য রথী না হোস্, তবে অন্ততঃ সাহিত্য-কোচোয়ান বা গাড়োয়ান্ হ'বিই হ'বি! আর ঐ আগেই বলেছি, কবিবর না হোস্, কপিবর ত হ'বিই!

তুই কবি না হ'লে ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি যে একজন প্রতিভাসম্পন্ন জবরদস্ত কবি, তা'তে সন্দেহ নাস্তি! প্রমাণস্বরূপ,—আমি হ'লে তোর ঐ বর্ষাস্নাতা সাগরসৈকতবাসিনী করাচির বর্ণনাটা কি রকম কবিত্বপূর্ণ ভাষায় কর্‌তাম, অবধান কর্ (যদিও বর্ণনাটা 'আন্দাজিক্যালি' হবে!):—

ঝরা থেমেছে। উলঙ্গ প্রকৃতির স্থানে স্থানে এখনও জলের রাজ্য থৈ-থৈ

কর্‌চে। দেখে বোধ হচ্ছে যেন একটি তরুণী সবেমাত্র স্নান করে' উঠেছে; আর তার ভেজা পাতলা নীলাম্বরী শাড়ী ছাপিয়ে নিটোল উন্মুখ যৌবন ফুটে' ফুটে' বেরিয়েচে। এখনও ঘুনঘুনে মাছির চেয়েও ছোট মিহিন্ জলের কণা ফিন্ ফিন্ করে ঝরছে! ঠিক যেন কোন সুন্দরী তার একরাশ কালো কশ-কশে কেশ তোয়ালে দিয়ে ঝাড়ছে, আর তারই সেই ভেজা-চুলের ফিন্‌কীর ঝাপ্‌টা আমাদের এমন ভিজিয়ে দিচ্চে! এখনও র'য়ে র'য়ে ক্ষীণ বিজুলী চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌ছে, ও বুঝি ঐ সুন্দরীর তড়িতাঙ্গ সঞ্চালনের ললিত-চঞ্চল-গতি-রেখা! আর ঐ যে ক্ষান্ত বর্ষণ-স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় মুগ্ধ দু-চারটি গায়ক-পাখীর ঈষৎ-ভেসে-আসা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, ও বুঝি ঐ স্নাতা সুন্দরীর চারু নূপুরের রুনু-ঝুনু কিংবা বলয়-কাঁকনের সিঞ্জিনী। আর ঐ যে তার শেফালীর বোঁটায়-ছোবানো ফিরোজা রং এর মল্‌মলের মত মিহিন্ শাড়ী আর তা'তে ঘন-সবুজ-পাড় দেওয়া, ওতে যেন কে ফাগ্ ছড়িয়ে দিয়েছে! ও বোধ হয় আবিরও নয় ফাগ্ ও নয়,— কোনও একজন বাদশাজাদা ঐ তরুণীর ভালোবাসায় নিরাশ হ'য়ে ঐ দুটি রাতুল চরণতলে নিজেকে বলিদান দিয়েছে আর তারই কলিজার এক ঝলক্ খুন ফিং দিয়ে উঠে' সুন্দরীর বাসন্তী-বসন অমন ক'রে' রক্ত-রঞ্জিত করে' তুলেছে,—ওগো, তাই এ সাঁঝ বেলাতে সুন্দরীর মন এত ভারি—

কেমন লাগলো? দেখ্‌লি তা আমি তোর মত আর ছোট কবি নই! কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় রে নূরু যে; কেউ আমায় চিন্‌তে পারলে না! পরে কিন্তু দেশের লোককে পস্তা'তে হবে; বলে' রাখচি। তুই হয় ত হাসছিস, কিন্তু আমি বলি কি, তার একটা মস্ত কারণ আছে। রবি বাবুকে ইয়োরোপ আর আমেরিকার লোক যে রকম বড় আর উঁচু ক'রে দেখে, আমাদের দেশ সে রকম পারে কি? উল্টো, যারা তাঁর লেখার এক কানা, কড়িও বোঝেন না, তাঁরাই আবার যত রকম পারেন তাঁর নিন্দা করেন, যেন এই সব সমালোচক রবি কবির চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, তবে তাঁরা সেটা দেখাতে চান না. আর দেখালেও নাকি দেশে কেউ সমঝদার নেই! এঁরাই কিন্তু মনে মনে রবিবাবুর পায়ে লক্ষ হাজার বার সালাম না করে' থাকতে পারেন না, তবু বাইরে নিন্দে কর্‌বেনই! কাজেই এ সব লোককে সমালোচক না বলে' আমি বলি পরশ্রীকাতর। এর একটা আবার কারণও আছে; আমরা দিনরাত্তির তঁকে চোখের সামনে দেখ্‌ছি, আর যাকে হরদম্ দেখতে পাওয়া যায়, এমন একটা ব্যক্তি যে সারা দুনিয়ার "মশ্‌হুর" একজন লোক হবেন, এ আমরা সইতে পারি নে। তাই অধিকাংশ কবিই জীবিতকালে শুধু লাঞ্ছনা আর বিড়ম্বনাই ভোগ করেছেন। ধর, আমার

লেখা যদি ছাপার অক্ষরে বেরোয়, তবে ভয়ানক আশ্চর্য হ'য়ে যাবে। কারণ, আমারও তাদেরি মত দুটো পা। কোন একটা অতিরিক্ত অঙ্গ, অন্ততঃ পেছনে একটা লেজুড়ও নেই,—যার থেকে আমি একটা এ রকম অস্বাভাবিক জানোয়ারে পরিণত হ'তে পারি!—এক দিনকার একটা মজা শোন্! একটা উচ্চ মাসিক পত্রিকায় আমার লেখা একটা গল্প প্রকাশিত হ'তে দেখে', আমার এক বন্ধু ভয়ানক অবাক হ'য়ে চটে' বলেছিলেন—"আরে মিঞা, হঃ! আমি না কইছিলাম যে, এ সব কাগজ লইতাম না? এইসব ফাজিল চ্যাংরারা যাহাতে ল্যাহে, হেই কাগজ না আবার মানুষে পরে? আমার চারড্যা ট্যাহা না একেবারে জলে পড়লো নি!"

যাক্, সৈনিক জীবন কেমন লাগচে? ও-জীবন আমার মত নরম চারড়ার লোকের পোগায় না রে ভাই, তোর মত ভূতো মারহাট্টা ছেলেদেরি এসব কোস্তাকুস্তি সাজে!

তুই শুনে' খুব খুশি হবি যে, যে লোকগুলো তোর মত এমন ধড়ফড়ে' ইংলিশ্ ছোক্রাকে দু'চোখে দেখ্তে পারত না, তারাও এখন তোকে রীতিমত ভয়-ভক্তি করে, তবে তাঁরা এটাও বল্তে কসুর করেন না যে তোদের মত মাথা-খারাপ শয়তান ছোকরাদেরই জন্যে এ বঙ্গবাহিনীর সৃষ্টি।

তারপর একটা খুব গুপ্তকথা!—বুবু সাহেবা আমায় ক্রমাগত জানাচ্ছেন যে, যদি আমার ওজর আপত্তি না থাকে, তা হ'লে শ্রীমতী সোফিয়া খাতুনের (ওর্ফে তাঁর ননদের) পানিপীড়ন ব্যাপারটা আমার সঙ্গেই সম্পন্ন করে' দেন। ও-রকম একটা খোশ খবর শুনে' আমার খুবই খোশ' হওয়া উচিত ছিল, কেননা তা হ'লে রবিয়ল মিঞাকে খুব জব্দ করা যেত। তিনি আমার ভগ্নীকে বিয়ে করে, আইনমতে আমায় শালা বলবার ন্যায্য অধিকারী সন্দেহ নেই, কিন্তু রাত্তির দিন ভদ্র অভদ্র লোকের মজ্‌লিসে মহ্‌ফিলে যদি ঐ একই তীব্র মধুর সম্বন্ধটা বারবার শতেকবার জানিয়ে দেওয়া হয়, তাহ'লে নিতান্ত নিরীহ প্রাণীরও তা'তে আপত্তি কর্‌বার কথা! খুব ঘনিষ্ঠ আর সত্যিকার মধুর সম্বন্ধ হ'লেও লোকে 'শালা আর শ্বশুর' এই দুটো সম্বন্ধ স্বীকার করতে স্বতই বিষম খায়, এ একটা ভাহা সত্যি কথা! অতএব আমিও জায়বদ্‌লি বা exchange স্বরূপ তাঁর সহোদরার পাণিপীড়ন করলে তাঁর বিষদাঁত ভাঙ্গা যাবে নিশ্চই, তবে কিনা সেই সঙ্গে আমারও তিন পাঁচে পঁচাত্তর' দাঁত ভাঙ্গা যাবে! কেননা বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, আমার ভবিষ্যৎ অঙ্কলক্ষ্মীঠী আদৌ গো-বেচারী প্রিয়ভাষিনী নন, বরং তাঁতে লক্ষ্মীমেয়ের কোন গুণই বর্ত্তে নাই। সব চেয়ে

বেশী ভয়, ইনি আবার ভয়ানক বেশী সুন্দরী, মানে এত সুন্দরী, যাদের 'চরণতলে লুটিয়ে পড়িতে চাই, বা 'জীবনতলে ডুবিয়া মরিতে চাই, আর কি! যাদের ঈষৎ আড়চোখা চাউনিতে আমাদের মাথা একেবারে বিগ্‌ড়ে' যায়। যাদের ঠোঁটের কোণে একটুহাসির রেখা দেখে আমরা আনন্দে অস্বাভাবিক রকমের বদন ব্যাদান করে' 'দেহি-পদপল্লবমুদারম্‌ ব'লে হুমড়ি খেয়ে পড়ি।—আজকাল ঐ ঘোড়া রোগেই গরীব কাঁচা যুবকগুলো মর্‌ছে কিনা—আর নূরু, লাজের মাথা খেয়ে সত্যি কথা বল্‌তে কি ভাই, অহম্‌ গরীব নাবালক ঐ রোগেই মরেছে রে, ঐ রোগেই ম—রে—ছে! জানি না আমার কপালে শেষ পর্য্যন্ত কি আছে, মুড়ো-ঝাঁটা না মিষ্টি ঠোনা!

তোর মত কি? কি বলিস্‌—দেবোনাকি চোখ-মুখ বন্ধ করে' বিয়েটা......? (আঃ একটু ঢোক্‌ গিলে নিলুম রে?)

বাড়ীতে বাস্তবিকই সকলেবড়েডামুস্‌ড়ে' পড়েছেন তোর এইচ'লেযাওয়াতে। আমাদের গ্রামটায় প্রবাদের মত হ'য়ে গিয়েছিল যে, তোর আর আমার মত এমন সোনার চাঁদ ছেলে আর এমন অকৃত্রিম বন্ধুত্ব লোকে নাকি আর কখনও দেখে নি। এক সঙ্গে খাওয়া, এক সঙ্গে পড়তে যাওয়া, এক সঙ্গে বাড়ী আসা, ওঃ, সে কথাগুলো জানাতে হ'লে এমন ভাষায় জানাতে হয়, যে ভাষা আমার আদৌ আয়ত্ত নয়। ও রকম "সতত সঞ্চরমান নবজলধরপটলসংযোগে" বা "ক্ষিত্য-প্তেজো পটাক্‌ দুন" ভাষা আমার একেবারেই মনঃপুত নয়! পড়তে যেন হাঁপানী আসে, আর কাছে অভিধান খুলে রাখ্‌তে হয়; অবিশ্যি, আমার এ মতে যে অন্য সকলের সায় দিতে হবে, তারও কোন মানে নেই। আমারও এ বিকট রচনাভঙ্গী নিশ্চয়ই অনেকেরই বিরক্তিজনক, এমন কি অনেকে একে 'ফাজলামী' বা 'বাঁদরামী' ব'লেও অভিহিত করতে পারেন, কিন্তু আমার এ হাল্‌কাভাবের কথা—হাল্‌কা ভাষাতেই বলা আমি উচিত বিবেচনা করি। তার ওপর, চিঠির ভাষা এর চেয়ে গুরুগম্ভীর করলে সেও একটা হাসির বিষয় হবে বৈ ত নয়!—যাক্‌, কি বলছিলাম? এখন যখন আমি একা তাঁদের বাড়ী যাই, তখন বুবু সাহেবা আর কিছুতেই কান্না চেপে রাখতে পারেন না। তাঁর যে শুধু ঐ কথাটাই মনে পড়ে, এম্‌নি ছুটিতে আমরা দু'জনে বরাবর এক সঙ্গে বাড়ী এসেছি। তার পর যতদিন থাকতাম, তত দিন বাড়ীটাকে কি রকম মাথায় করেই না রাখতাম?...

হ্যা, আমাদিগকে যে লোক 'মোল্লা দোপেয়াজা' বলে' ঠাট্টা করত, তুই চলে যাবার পর কিন্তু সব আমায় স্রেফ, একপেয়াজা মোল্লা' বলছে।

যাক্ ও-সব ছাইপাঁশ কথা—নূরু, কত কথাই না মনে হয় ভাই, কিন্তু বড় কষ্টে হাসি দিয়ে তোরই মত গা ঢাকাতে চেষ্টা করি !...আবার কি আমাদের দেখা হবে ?

পড়াশুনায় আমার আর তেমন উৎকট ঝোঁক নেই। আর কিছুতে মন বসে না। যাই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে ! ইতি—

কলেজক্লান্ত

মনুয়র্

সালার

৬ই ফাল্গুন

নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু,

ভাই নূরুল হুদা, আমার শত স্নেহাশীষ জানবে। অনেক দিন চিঠি দিতে পারি নি বলে' তুমি তোমার ভাই সাহেবের পত্রে অনুযোগ করে' বেশ একটু খোঁচা দিয়েছ। কি করি ভাই, সংসারের সব ঝক্কি এখন আমার ওপর। তুমি সব জান, আম্মাজান কিছু দেখেন না। আগে বরং দু-এক সময় তিনি বিষয়-আশয়ের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে দুটো উপদেশ দিতেন। এখন তাও বন্ধ। দিন-রাত নামাজ রোজা নিয়ে নিজের ঘরটিতে আবদ্ধ, আর বাইরে এলেই ওঁর ওপর খুকীর তখন ইজারা দখল ঃ

তার পর তোমার ভাই সাহেবের কথা আর বোলো না। দিনেরাত্তিরে 'কম্‌সে কম্' পঁচিশ কাপ্ চা গিলচেন আর বই নিয়ে, না হয় এস্রাজ্ নিয়ে মশ্‌গুল আছেন ! ঐসব বলতে গেলেই আমি হই "পাড়া-কুঁদুনী, রণচণ্ডী, চামুণ্ডা" আর আরো কত কি ; আমার মত এই রকম আরো গোটা কতক সহধর্ম্মিণী জুটলেই নাকি স্বামীস্বত্বে স্বত্ববান বাঙ্‌লার তাবৎ পুরুষপালই জব্দ হ'য়ে যাবেন ! কপাল আমার ! তা যদি হয়, তা' হলে বুঝি যে একটা মস্ত ভাল কাজ করা গেল। এ দেশের মহিলারা যখন সহধর্ম্মিণীর ঠিক মানে বুঝতে পারবেন, স্বামীর দোষকে উপেক্ষা না ক'রে তার তীব্র প্রতিবাদ করে' স্বামীকে সৎপথে আনতে চেষ্টা করবেন, তখনই ঠিক স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ হবে। স্বামীকে আস্কারা দিয়ে পাপের পথে যেতে দেয় যে-স্ত্রী, সে আর যাই হোক, সহধর্ম্মিণী

হয়। যাক্ ওসব কথা ; এখন আমার ইতিহাসটা শোন, আর বল আমি কি করে' কোন্ দিক সামলাই।—সাংসারিক কোন কথা পাড়তে গেলেই তোমার ভাই সাহেবের ভয়ানক মাথা দপ্ দপ্ করে, কাজেই দু'—তিন কাপ টাট্কা চায়ের জোগাড় করতে হয়। চা টা যদি একটু ভাল হ'ল, তবে আর যায় কোথা ? একেবারে দিলদরিয়া মেজাজ্। আরাম কেদারায় সটান শুয়ে পড়েন, আর যা বলব তাতেই 'হু'! তোমার সদাশিব কথা ভয়ানকভাবে খেটেছে ও'র ওপর। কিন্তু ভাই এতে ত আর সংসার চলে না। বিষয়-আশায় জমিদারী সব ম্যানেজারের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে ভাং-খাওয়া বাবজীর মত বেহুঁস হ'য়ে প'ড়ে থাকলে কি সব ঠিক থাকে, না কাজেরই তেমনি শৃঙ্খলা হয় ? মাথার উপর মুরুব্বী থাকাতে এত দিন যা' করেছেন সেজেছে। আমি ত হদ্দ হ'লাম বলে' বলে'। কতই আর প্যাঁচা-খ্যাঁচরা করব মানুষকে ? একটু বুঝিয়ে বলতে গেলেই মুখটি চুপ করে আস্তে আস্তে সেখানে হ'তে সরে পড়া হয় ? সে দিনের মতোই একেবারে গুম্। সন্ধ্যে নাগাদ্ আর টিকিটির পর্য্যন্ত দেখা নেই। আমি ত নাচার হ'য়ে পড়েছি ওকে নিয়ে। পড়তেন জাহাবাজ মেয়ের হাতে, তবে বুঝতেন, কত ধানে কত চা'ল। তুমি যত দিন ছিলে, তত দিন যা এক আধটু কাজকর্ম্ম দেখতেন। তুমি যাওয়ার পর থেকেই উনি এ রকম উদাসীনের মত হ'য়ে পড়েছেন।—আর তুমিই যে অমন করে' চলে' যাবে, তা' কে জানত ভাই ?—আজ আমি সন্তানের জননী, সংসারের নানান্ ঝঞ্ঝাট আমারই মাথায়, কাজেই চিন্তা করবার অবসর খুব কমই পাই তবুও ঐ হাজার কাজের ফাঁকে তোমার সেই শিশুর মত সরল শান্ত মুখটি মনে প'ড়ে আমায় এত কষ্ট দেয় যে, সে আর কি বলব! আজ চিঠি লিখতে বসে' কত কথাই না মনে পড়ছে!

আমি যখন প্রথম এ ঘরের বৌ হ'য়ে আসি, তখন ঘরটা কি জানি কেন বড্ডো ফাঁকা-ফাঁকা বলে বোধ হ'ত। ঘরে আর কেউ ছেলেমানুষ ছিল না যে কথা ক'য়ে বাঁচি। আমাদের সফি আর পাশের বাড়ীর মাহ্বুবা তখনও নেহাত্ ছেলেমানুষ, আর সহজে আমার কাছেও ঘেসত না। কে নাকি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, আমি মেম সাহেব! কত কষ্টে যে তার ভয় ভাঙাতে হয়েছিল। তার পর কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন তোমার ভাই সাহেব তোমায় আবিষ্কার করে' ধরে আনলেন। তুমি নাকি তখন স্কুলে যাওয়ার চেয়ে মিশ্ন, সেবাশ্রম প্রভৃতিতেই ঘুরে বেড়াতে। টোঁ টোঁ সন্ন্যাসী বা দরবেশগোছের কিছু হবে ব'লে মাথায় লম্বা চুলও রেখেছিল, মাঝে মাঝে আবার গেরুয়া বসন পরতে। এই সব অনেক কিছু কারণে তোমার ভাই

সাহেব তোমাকে একজন মহাপ্রাণ মহাপুরুষের মতই সমীহ করলেও আমি এক দিন বলেছিলাম, যে এ সব হচ্ছে আজকালকার ছোকরাদের উৎকট বাজে ঝোঁক আর অন্তঃসার শূন্য পাগলামী। তবে লম্বা চুল রাখবার একটা গূঢ় কারণ ছিল,—সে হ'চ্ছে, তুমি একজন "মোখ্‌ফি" আর কবি হ'লেই লম্বা চুল রাখতে হবে। অবশ্য, এ আমি তোমার লুকানো কবিতার খাতা দেখে বলছি তা মনে ক'রো না—তবে তুমি বলতে পার যে, তোমার উদাসীন হবার যথেষ্ট কারণ ছিল; তোমার বাপ-মা সবাই মারা পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার সমস্ত স্নেহ-বন্ধনই কালের আঘাতে ছিন্ন হ'য়ে গেল। কিন্তু সত্য বলতে গেলে এ-সবের পেছনে কি আর একটা নিগূঢ় বেদনা লুকানো ছিল না ভাই? আগেও আমার ছোট ভাই মনুর কাছে শুনেছিলাম। তোমাতে আর মনুতে যে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল, তা'ও ওরই মুখে শুনেছিলাম। তবে সে তোমার যে সব গুণের কথা বলত, তাতে স্বতঃই লোকের মনে হবার কথা যে, এ ধরণের জীবের বহরমপুরই উপযুক্ত স্থান। কয়েকবার বিপন্নকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে' তুলেছিলে, এমন কথা শুনেও আমি ব'লেছিলাম, ও সব রক্তগরম তরুণদের খামখেয়ালী বা ফ্যাসান। ওর সঙ্গে একটা উৎকট্ যশো-লিপ্সাও যে আছে, তাও আমি অসঙ্কোচে বলতাম। কিন্তু যে দিন তোমার ভাই সাহেব আর আমার ছোট ভাইটির সাথে আমাদের ঘরে অসঙ্কোচে নিতান্ত আপন জনের মত এসে তুমি দাঁড়ালে, তখন বাস্তবিকই এক পলকে আমার ও-সব মন্দ ধারণাগুলা একেবারে কেটে গেল। তোমার ঐ নির্বিকার ঔদাস্যের ভাসা ভাসা করুণ কোমল দৃষ্টি আর শিশুর মন, অনাড়ম্বর সহজ সরল ব্যবহার দেখে আপনি তোমার ওপর একটা মায়া জন্মে গেল। আর যারা নিজেদের প্রতি এ রকম উদাসীন, তাদের প্রতি মায়া না হ'য়েই যে পারে না! তাই সে দিন আমার বাপ-মা মরা অনাথ ছোট ভাইটির সাথে তোমাকেও আমার আরো একটি ছোট ভাই বলে, ডেকে নিলাম!

তোমার সরল অট্টহাস্যে এই ঘর এক দিন মুখরিত হ'য়ে উঠেছিল—গল্পের রহস্যালাপের তোড়ে এই ফাঁকা ঘরকেই তুমি মজলিসের মত সরগরম করে তুলেছিলে,—সেই ঘর আজো আছে; তবে, তেমনি ফাঁকা! অনাহিল ঝর্ণা ধারার মত উদ্দাম হাসির ধারায় সে ঘরকে কেউ আর বিকৃত করে না, তাই সে নীরব নিঝুম এক ধারে প'ড়ে আছে। আমাদেরও কেউ আর তেমন অনর্থক উৎপাতের জুলুমে তেতো-বিরক্ত ক'রে তোলে না, তেমন উন্মাদ হট্টগোলে বাড়ীকে মাথায় করে' তোলে না, তাই আমাদেরও কাজে আর সে প্রাণ সে উৎসাহ নেই! সব "যেন মন-মরা। ফাল্গুন বনের বুকভরা দুষ্টুমির চপলতা

যেন অসম্ভাবিত রূপে আসা পৌষের প্রকোপে একেবারে হিম হয়ে গেছে !"
—এই রকম বিরক্ত হওয়াতেও যে একটা বেশ আনন্দ পাওয়া যেত এ-ত অস্বীকার করতে পারে না।

আচ্ছা ভাই নূরু ! তুমি কেন এমন করে আমাদের না ব'লে না ক'য়ে চলে' গেলে ? অবশ্যি, আমাদের বললে হয় ত সহজে সম্মতি দিতাম না, কিন্তু যদি নিতান্তই জোর করতে আর আমরা দেখতাম যে, তোমার ব্যক্তিগত জীবনে একটা সত্যিকার মহৎ কাজ করতে যাচ্ছ, তা হ'লে আমরা কি এতই ছোট যে তোমায় বারণ ক'রে রাখতাম ? তোমার গৌরবে কি আমাদেরও একটা বড় আনন্দ অনুভব করবার নেই ?

তোমার ভাই সাহেব সদা সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকতেন,—তুমি কখন কি ক'রে বস এই ভেবে, এই নিয়ে আমি কতদিন তাঁকে ঠাট্টা করেছি, এখন দেখছি, ওঁরই কথা ঠিক হ'ল।

তুমি তোমার প্রাণের অনাবিল সরলতা আর প্রচ্ছন্ন-বেদনা দিয়ে যে সকলকে যত বেশী আপনার ক'রে তুলেছিলে, তা তুমি নিজেও বুঝতে পারনি। তুমি যে অনবরত হাসির আর আনন্দের সবুজ রং ছড়িয়ে প্রাণের বেদনা-অরুণিমার রক্তরাগকে লুকিয়ে রাখতে আর তলিয়ে দিতে চাইতে, এটা আমার কখনও চক্ষু এড়ায়'নি। তাই তোমার এই হাসিই অনেক সময় আমায় বড়ই কাঁদিয়েছে। তোমার ঐ ঘোর-ঘোর চাউনীতে যে বেদনার আভাস ফুটে উঠত, সে যে সব চেয়ে অরুন্তুদ্ !—মা'র মত গম্ভীর লোকও তুমি চলে যাবার পর কত অঝোর নয়নে কেঁদেছেন। তোমার ভাই ত পাথরের মত হয়ে পড়েছিলেন। খুকী পর্য্যন্ত কেমন 'হেদিয়ে' গিয়েছিল।

তোমার ভাই সাহেব এখনও : আক্ষেপ করে বলেন,—"হয় ত আমাদের দোষেই নূরু আমাদের ছেড়ে গেল !" আমি তা বিশ্বাস করি না। কেন না সে রকম কিছু ত কোন দিন ঘটেনি। সত্যি বটে, তুমি অতি অল্পতেই রেগে উঠতে, কিন্তু সেটাকে রাগ বললে ভুল বলা হবে। ওটাকে রাগ না বলে' সোজা কথায় বলা উচিত ক্ষেপে ওঠা ; ঠিক যেন ঘাড়ের ঘুমন্ত একটা ভূতের ঝাঁ করে একটা মাথা নাড়া দিয়ে ওঠা, কাজেই ওতে না রেগে আমোদই পেতাম বেশী। একটা ক্ষেপা লোককে যে ক্ষেপিয়ে যে কত আমোদ, তা যারা ক্ষেপাতে জানে। তারাই বোঝে। তোমার স্কন্ধ-বাসী ভূত মহাশয়কে খুঁচিয়ে তাতিয়ে তোলা তাই এত বেশী উপভোগের জিনিষ ছিল আমাদের। তবে 'উনি' যে তোমায় একটা আবছায়া ব'লে উপহাস করেন, সেইটাই সত্যি না কি ?

আমায় বড় বোন বলে ভাবতে, তাই তোমার দুটি হাত ধরে অনুরোধ করছি, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, তোমার সব কথা লিখে জানাবে কি? সে সব কথা নিতান্ত আপত্তিকর বা গোপনীয় সে কথা আমি আন্দাজেই বুঝে নেবো, তোমার স্পষ্ট ক'রে খুলে লিখতে বলছি নে। মেয়েদের বিশ্বাসঘাতক বলে বদ্‌নাম থাকলেও আমি কথা দিচ্ছি যে, তোমার কোন কথা কাউকে জানাব না। বড় বোনের ওপর এতটুকু বিশ্বাস রাখতে পার কি?

এখন আমাদের সোফিয়া মাহ্‌বুবা সম্বন্ধে দু-একটা কথা তোমায় জানানো দরকার ব'লে জানাচ্ছি, বিরক্ত হ'য়ো না বা রাগ করো না।—লক্ষ্মীটির মত তখন যদি তাকে তোমার অঙ্কলক্ষ্মী ক'রে নিতে, তবে বেচারীদের এত কষ্ট পেতে হত না। তুমি জান, একে বেচারীদের অবস্থা ভাল ছিল না—বিপদের উপর বিপদ—সেদিন তার বাবাও আবার সাত দিনের জ্বরে মারা গেছেন। এক মামারা ছাড়া ত তাদের খোঁজ খবর নেবার কেউ ছিল না দুনিয়ায়, তাই তারা এসে সেদিনে মাহ্‌বুবাদের সবকে নিজের ঘরে নিয়ে গেছেন। এত বুঝালাম, অনুরোধ করলাম আমরা, এমন কি পায়ে পর্যান্ত ধরেছি—কিন্তু মাহ্‌বুবার মা কিছুতেই আমাদের বাড়ীতে থাক্‌তে রাজী হলেন না। থাকবেনই বা কি করে? তুমিই তো ওঁদের এদেশ ছাড়ালে! যে অপমান তুমি করেছ ওদের যে আঘাত দিয়েছ ওঁদের বুকে, যে রকম প্রতারিত করেছ ওঁদের আশালুব্ধ মনকে, তাতে অবস্থাপন্ন লোক হলে তোমার ওপর এর রীতিমত প্রতিহিংসা না নিয়ে ছাড়তেন না। তাঁদের অবমাননা-আহত প্রাণের এই যে নীরব কাৎরানী, তা যদি সবার বড় বিচারক খোদার আরশে গিয়ে পৌঁছে, তাহলে তার যে ভীষণ অমঙ্গলবজ্র তোমার আশে-পাশে ঘুরবে, তা ভেবে আমি শিউরে উঠছি, আর দিনরাত খোদাতালার কাছে তোমার মঙ্গল কামনা করছি! এই যে মাহ্‌বুবের বাবা হঠাৎ মারা গেলেন, এতে আমরা বলব, তাঁর হায়াত ছিল না—কে বাঁচাবে; কিন্তু লোক বলছে, তোমার হাতের সেই অপমানের আঘাতেই তাকে পাঁজর ভাঙ্গা ক'রে দিয়েছিল। আর বাস্তবিক, ওঁরা ত কেউ প্রথমে রাজী হন নি বা বড় ঘরে বিয়ে দিতে আদৌ লালায়িত ছিলেন না আমিই না হাজার চেষ্টাচরিত্তির করে সম্‌ঝিয়ে ওঁদের রাজী করি। তোমার ভাই সাহেব কিন্তু প্রথমেই আমায় 'বারবার' মানা করেছিলেন—শেষে একটু গণ্ডগোল হবার ভয়ে, কিন্তু আমি তা শুনি নি! আমি সে সময় একটা ধারণা করেছিলাম, যা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। তুমি হাজার অস্বীকার করলেও আমি জোর ক'রে বলতে পারি যে, মাহ্‌বুবাকে দেখে তুমি নিজেও মরেছিলে আর তাকেও মিথ্যা আশায় মুগ্ধ করে নারী-জীবনটাই হয়ত ব্যর্থ করে দিলে। অবস্য তোমাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে

মেলা-মেশা এমন কি দেখাশুনা পর্যন্ত ঘটে নি এ আমি খুব ভাল করেই জানি, কিন্তু ঐ যে পরের জোয়ান মেয়ের দিকে করুণদৃষ্টি দিয়ে ড্যাব্ করে চেয়ে থাকা, তার মনটি অধিকার করতে হাজার রকমের কায়দা কেরদানি দেখানো এ সব কি জন্যে হ'ত? এগুলো ত আমাদের চোখ এড়ায়নি! খোদা আমাদেরও দু-দুটো চোখ দিয়েছেন, এক আধটু বুদ্ধিও দিয়েছেন। আর কেউ বুঝুক, আর না বুঝুক আমি বডড বুকভরা স্নেহ দিয়েই তোমাদের এ পুর্ব্বরাগের শরম-রঙীন ভাবটুকু উপভোগ করতাম, কারণ আমি জানতাম, দুদিন বাদে তোমরা স্বামী-স্ত্রী হতে যাচ্ছ, আর তাই আমাদের সমাজে এ পুর্ব্বরাগের প্রশ্রয় নিন্দনীয় হ'লেও দিয়েছি। নিন্দনীয়ই বা হবে কেন? দুইটি হৃদয় পরস্পরকে ভাল করে চিনে নিয়ে বাসা বাঁধলেই ত তাতে সত্যিকার সুখ-শান্তি নেমে আসে! যেমন আকাশের মুক্ত পাখীরা। দেখেছ তাদের দুটিতে কেমন মিল? তারা কেমন দুজনকে দু-জন চিনে নিয়ে মনের সুখে বাসা বাঁধে ঘর-কন্না করে। এ দেখে যার চোখ না জুড়ায়, সে লোক দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ হিংসুক। হৃদয়ের এ অবাধ পরিচয় আর মিলনকে যে নিন্দনীয় বলে, সে বিশ্ব-নিন্দুক। যাক্ সে সব বাজে কথা কিন্তু তুমি কোন্ সাহসে বাঁশীর সুরে একটি কিশোরী হরিণীকে কাছে এনে তাকে জালিমের মত এমন আঘাত করলে! এই খানেই তোমাকে ছোট ভাবতে আমার মনে বড়ডো লাগে! এর মূলে কি কোন বেদনা কি কোন কিছু নিহিত নাই? ধর, এতে আমরা যে অপমান করেছ তা' নয়ত স্নেহের অনুরোধে ক্ষমা করলাম, কিন্তু অন্যে সে অপমান সইবে কেন? তাদের ত তার অধিকার দাওনি! আর তোমার যদি বিয়ে ক'রবার একান্ত ইচ্ছা ছিল না, তবে প্রথমে কি ভেবে—কিসের মোহে পড়ে রাজী হয়েছিল? আবার রাজী হ'য়ে যখন সব ঠিকঠাক,—তখনই বা কেন এমন ক'রে চলে গেলে? গরীব হ'লেও তাঁদের বংশমর্য্যাদা অনেক উচ্চ এটা তোমার ভাবা উচিত ছিল।

"কিছু মনে করো না। বড়ডো বুক তোলপাড় ক'রে উঠলো, তাই উত্তেজিত হয়ে হয়ত অনেক কর্কশ কথা লিখলাম। তোমার ওপর আমার স্নেহের দাবী আছে ব'লেই এত কথা জোর করে কঠিনভাবে বলতে পারলাম। তা'ছাড়া বরাবরই দেখছো আমি একটু অন্য ধরণের মেয়ে। যা সত্যি, অপ্রিয় হলেও তা' বলতে আমি কখনও কুণ্ঠিত হই না। যাকে স্নেহ করি, তার অন্যায়টাই বুকে সবচেয়ে বেশী বাজে।

সোফিয়ার চেয়েও মাহবুবার ওপর আমার বেশী মায়া জন্মে গেছিল। মেয়েটা যেমন শান্ত তেমনি লক্ষ্মীমেয়ের সমস্ত গুণই তাতে বর্ত্তেছিল তা'ছাড়া দারিদ্রতার করুণ সসঙ্কোচ ছায়াপাতে তার স্বভাবসরল সুন্দর মুখশ্রী আরো

মর্ম্মস্পর্শী মধুর হয়ে ফুটে উঠতো আমার কাছে। সে যেদিন চ'লে গেল, সোফি সেদিন ডুকরে, ডুকরে, কেঁদেছিল, তিন-চার দিন পর্য্যন্ত তাকে এক ঢোক পানি পর্য্যন্ত খাওয়াতে পারি নি,—একেবারে যেন মরবার হাল! মা-ও না কেঁদে পারে নি। আহা, পোড়াকপালী কে আজ এমন ক'রে বাপ-দাদার ভিটে ছেঁড়ে চলে যেতে হ'ত যদি তুমি তার সোনার স্বপন এমন ক'রে ভেঙে না দিতে। অভাগী যাবার দিনে আমার গলাটা ধ'রে কি কান্নাই না কেঁদেছে! তার দু-চোখ দিয়ে যেন আঁসু'র দরিয়া ব'য়ে গিয়েছে! আর একদিন সে কেঁদেছিল ভাই লুকিয়ে এম্নি গুম্‌রে' কেঁদেছিল, যেদিন তুমি যুদ্ধে চ'লে যাও—আমার বুক্ ফেটে কান্না আস্‌ছে, এ হতভাগীর পোড়াকপাল মনে ক'রে।...সে সোমথ হ'য়ে উঠেছে, সুতরাং তার মামুরা যে তাকে আর খুবড়ো রাখবে তা'ত মনে ক'রতে পারি নে, বা, ও নিয়ে জোর করেও কিছু বলতে পারিনে। বোধ হয় ঐ খানেই কোথাও দেখে শুনে বে'-থা দেবে। তাঁদের অবস্থা খুব স্বচ্ছল হ'লেও বড্ডো কৃপন,—নাকি পিঁপড়ে চিপে গুড় বের করে। তাই বড় দুঃখ আর ভয়ে আমার বুক দুরু দুরু করছে! বানরের গলায় মুক্তোর মালার মত ও হতচ্ছাড়ী কার কপালে পড়ে' কে জানে। গরীব ঘরের মেয়ে হ'লেও সে আশরাফ ঘরের—তাতে অনিন্দ্যসুন্দরী, ডানাকাটা পরী বললেই হয়—তার ওপর মেয়েদের যে সব গুণ থাকা দরকার, খোদা তাকে তার প্রায় সমস্তই ডালি ভ'রে দিয়েছেন। আমিও তাকে সাধ্যমত লেখাপড়া, বয়নাদি চারুশিল্প, উচ্চ শিক্ষা—সব শিখিয়েছি। কেন এত ক'রেছিলাম? আমার খুবই আশা ছিল, তার রূপগুণের ফাঁদে প'ড়ে তোমার মতন সোনার হরিণও ধরা দেবে, তোমার এই লক্ষ্যহীন, বিসৃঙ্খল বাঁধন-হারা জীবনের গতিও একটা শান্ত সুন্দরকে কেন্দ্র ক'রে সহজ স্বচ্ছন্দ ছন্দে ব'য়ে যাবে,—পাশের মাঠে সবুজ শ্যামলতার সোনার স্মৃতি রেখে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, খোদা করেন আর! কারুর দোষ নেই ভাই, দোষ ওরই পোড়াকপালের—আর সব চেয়ে বেশী দোষ আমার।

মানুষ শেখে দেখে, নয়ত ঠেকে। আমিও জীবনে মস্ত একটা ভুল ক'রতে গিয়ে দস্তুরমত শিক্ষা পেলাম। নানান দেশের নানান রকমের গল্প উপন্যাস প'ড়ে আমার একটা খর্ব্ব হ'য়েছিল যে, লোক-চরিত্র বুঝবার আমার অগাধ ক্ষমতা কিন্তু আমার সকল অহঙ্কার চোখের জলে ডুবে গেল।

যাক্ তোমায় অনেক বক্‌লাম, ঝকলাম, অনেক উপদেশ দিলাম, অনেক আঘাত করলাম, তাই শেষে একটা খোশ খবর দিচ্ছি, অবশ্যি সেটার সমস্ত কিছু ঠিক হ'য়ে যায় নি, তবে কথায় আছে "খোশ-খবর কা ঝুঁটা ভি আচ্ছা!"

কথাটা আর কিছু নয়,—আমার হাড় জ্বালানে ননদিনী শ্রীমতী সোফিয়া খাতুনের বিয়ে ! বিয়ে ! আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভবদীয় সখা, শ্রীমান মনুয়রের সঙ্গে ! বুঝেছো ? মনুর বি-এ পরীক্ষার ফলটা বেরুলেই শুভ কাজটা শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর শেষ ক'রে দেবো মনে করছি। এবার মনুর দু-দুটো বি-এ পাশ। কথাটা হঠাৎ হ'ল ভেবে তুমি হয়ত অবাক হ'য়ে যাবে, কিন্তু ওতে অবাক হবার কিছুই নেই। অনেকদিন থেকেই ওটা আমরা ভিতরে ভিতরে সমাধান ক'রে রেখেছিলাম এবং সেই সঙ্গে সবিশেষ সতর্ক হয়েছিলাম যাতে কথাটা তোমাদের দুই ফাজিলের এক জনেরও কানে গিয়ে না ঢোকে ! কারণ তুমি আর মানু এই দুটী বন্ধুতেই এত বেশী বেয়াদব আর 'চেবেল্লা' হ'য়ে প'ড়েছিলে যে, অনেক তোমাদের শয়তানের ভায়রা-ভাই বলতেও কসুর করত না। এই বিয়ের কথাটা কর্ণকুহরে তোমাদের প্রবেশ করলে তোমরা যে প্রকাশ্যেই ঐ কথাটা নিয়ে বিষম আন্দোলন আলোচনা লাগিয়ে দিতে, তা'তে কোনই সন্দেহ নেই। আগে নাকি ছেলেরা মুরুব্বিদের সামনে বিয়ের কথা নিয়ে কখনও 'টু' পর্য্যন্ত করতে সাহস ক'রত না, কিন্তু আজকালকার দু'পাতা 'ইঞ্জিরী'-পড়া ইঁচড়ে পাকা ডেঁপো ছেলেরা গুরুজনের নাকের সামনে তাদের ভাবী অর্দ্ধাঙ্গিনীর রূপ গুণ সম্বন্ধে বেহায়ার মত কাঁকাল 'কোমর' বেঁধে তর্ক জুড়ে দেয়—এই হচ্ছে প্রাচীন প্রাচীনাদের মত। ছিঃ মা, কি লজ্জা !

সোফিয়ার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সে বোধ হয় আজকাল দর্শন পড়্‌ছে কিম্বা অন্য কিছুতে (?) পড়েছে ! কেন না সে দিন যেন কেমন একরকম উন্মনা হয়ে পড়্‌ছে ! তোমার দেওয়া "উচ্ছল জলদল কলরব" ভাবটা তার আজকাল একেবারেই নেই। প্রায়ই গুরু গম্ভীর হ'য়ে কি যেন ভাবে—আর ভাবে ! তবে এতে ভয়ের কোন কারণ নেই, এই যা ভরসা ! কেন-না মেয়েরা অনেকেই বিয়ের আগে ও-রকম একটু মন উড়ু উড়ু ভাব দেখিয়ে থাকেন, এ আমাদের স্ত্রী-অভিজ্ঞতার বাণী ! বিয়ের মাদকতা কি কমেরে ভাই ! হতভাগা তুমিই কেবল এ-রসে বঞ্চিত রইলে ! তা-ছাড়া, দুদিন বাদে যাকে দস্তুরমত গিন্নীপনা করতে হবে, আগে হ'তেই তাকে এ রকম গ্রাম্ভারি চা'লে ভবিষ্যতের একটা খস্‌ড়া-চিন্তা করতে দেখে হাস্য বা বিদ্রূপ করা অন্যায়,—বরং দুঃখ সহানুভূতি প্রকাশ করাই ন্যায়-সঙ্গত।

সোফিয়াকে সেদিন তোমায় চিঠি দেবার জন্যে বলতে গিয়ে ত অপ্রতিভের শেষ হ'তে হ'য়েছে আমায় ! আমার প্রস্তাবটা শুনে সে নাক সিট্‌কিয়ে—একটা বিচিত্র রকমের অঙ্গভঙ্গি করে—মুখের সামনে মেম-সাহেবদের মত চার পাঁচ পাক ফর্‌-ফর্‌ করে ঘুরে—দুই হাত নানান ভঙ্গীতে আমার নাকের উপর

একেবারে মুখ ভ্যাঙচিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—"আমার এত দায় কাঁদেনি—গরজ পড়েনি লোককে খোশামুদি কারে চিঠি দেবার!" আমি ত একেবারে 'থ'! কথাটা কি জানো?—সে বড্ডো বেশী অভিমানী কি-না, তাই এত-টুকুতেই রেগে টাসকণার মত 'ট্যাঁ' 'ট্যাঁ' করে ওঠে! তুমি সবাইকে চিঠি দিয়েছ আর তাকেই দাওনি, এবং নাকি নেহায়েৎ বেহায়াপনণা ক'রে তার ভাইকে তার বিয়ে না ছাই-পাশ সম্বন্ধে কি লিখেছে এই হ'ল তার আসল রাগের কারণ! তুমি এখানে থাকলে হয়ত সে রীতিমত একটা কোঁদল পাকিয়ে বসত, কিন্তু তার কোন সম্ভাবনা নেই দেখেই ভিতরে ভিতরে রাগে এমন গস্ গস্ করছে! এ সকলের সঙ্গে তার আরও কৈফিয়ৎ এই যে তার হাতের লেখা নাকি এতই বিশ্রী এবং বিদ্যাবুদ্ধি এতই কম যে, তোমার মত পণ্ডিতাগ্রগণ্য ধুরন্ধর ব্যক্তির নিকট তা নিয়ে উপহাসাস্পদ হ'তে সে নিতান্তই নারাজ। এ সব ত আছেই, অধিকন্তু তার মেজাজটাও নাকি আজকাল বহাল খোশ-তাবিয়তে নেই— অবশ্য আমার মত ছেঁদো, ছোট, বেহায়া লোকের কাছে কৈফিয়ৎ দিলে তার আত্ম-সম্মানে ধা গিগ্নে লাগ্‌বে ব'লে সে মনে করে! য়্যা আল্লাহ্!—কি আর করি ভাই। নাচার! আমি ভাল ক'রেই জানি যে, এর ওপর একটি কথা বললেই লঙ্কাকাণ্ড বেধে যাবে: আমায় চুল ছিঁড়ে, নুচে, খামচিয়ে, কামড়িয়ে গায়ে থুথু দিয়ে আমাকে এমন জব্দ আর বিব্রত ক'রে ফেলবে যে তাতে' আমি কেন, পাথরের মূর্ত্তিরও বিচলিত হবার কথা।

বাপ্‌রে বাপ্! যে জবরদস্ত জালিম জাঁহাবাজ মেয়ে!—আমার ত ভয় হচ্ছে, মনু ওকে সামলাতে পারলে হয়।

অনেক লেখা হ'ল! মেয়েদের এই বেশী বকা, বেশী লেখা প্রভৃতি কতকগুলো বাহুল্য জিনিস স্বয়ং ব্রহ্মাও নিরাকরণ করতে পারবেন না। আমরা মেয়ে মানুষ সব যেন কলের জল বা জলের কল! একবার খুলে দিলেই হ'ল!

*　　　*　　　*　　　*

যাক্ যা, হবার ছিল, হয়েছে। এখন খোদা তোমার বিজয়ী বীরের বেশে ফিরিয়ে আনুন, এই আমাদের দিন-রাত্তির খোদার কাছে মুনজাত। যে মহাপ্রাণ, অদম্য উৎসাহ আর অসম সাহসিকতা নিয়ে তরুণ যুবা তোমারা সবুজ বুকের তাজা খুন দিয়ে বীরের মত স্বদেশের মঙ্গল সাধন করতে, দুর্ণাম দূর করতে ছুটে গিয়েছে, তা হেরেমের পুরস্ত্রী হ'লেও আমাদের মত অনেক শিক্ষিতা ভগিনীই বোঝেন, তাই আজ অনেক অপরিচিতার অশ্রু তোমাদের জন্যে ঝর্‌ছে! (এটা মনে রেখো যে পৌরুষ আর বীরত্ব সব দেশেরই মেয়েদের

মস্ত প্রশংসার জিনিস, সৌন্দর্যের চেয়ে পুরুষের ঐ গুণটাই আমাদের বেশী আকর্ষণ করে !) অন্ধ স্নেহ-মমতা বড় কষ্ট দিলেও দেশমাতার ভৈরব আহ্বানে তাঁর পবিত্র বেদীর সামনে এই যে তুমি হাসতে হাসতে তোমার কাঁচা, আশা-আকাঙ্ক্ষায় প্রাণটা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছ, এ গৌরব রাখবার ঠাঁই যে আমাদের ছোট বুকে পাচ্ছিনে ভাই ! আজ আমাদের এক চক্ষু দিয়ে অশ্রুজল আর অন্য চক্ষু দিয়ে গৌরবের ভাস্কর জ্যোতিঃ নির্গত হ'চ্ছে !

খোদার 'রহম' ঢাল হ'য়ে তোমায় সকল বিপদ-আপদ হ'তে রক্ষা করুক এই আমার প্রাণের শেষ শ্রেষ্ঠ আশীষ !

এখন আসি ভাই ! খুকী ঘুম থেকে উঠে কাঁদছে :—শীগগীর উত্তর দিয়ো !—ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষিনী "ভাবী"
রাবেয়া

(ঘ)

শাহপুর
১০ই ফাল্গুন,
(নিঝুম রাত্তির)

ভাই শোফি !

অভিমানিনী, তুমি হয়তো এতদিনে আমার উপর রাগ ক'রে ভুরু কুঁচকে, ঠোঁট ফুলিয়ে গুম্ হ'য়ে বসে' আছ ! কারণ আমি আসবার দিনে তোমার মাথা ছুঁয়ে দিব্যি করেছিলাম যে গিয়েই চিঠি দেবো। আমার এত বড় একটা চুক্তির কথা আমি ভুলিনি ভাই, কিন্তু নানান কারণে, বারো জঞ্জালে পড়ে' আমায় এ-রকম ভাবে খেলো হ'য়ে পড়তে হ'ল তোমার কাছে ! সোজা ভাবেই সব কথা বলি'—এখানে পৌঁছেই বোন, আমার যত কিছু যেন ওলট পালট হ'য়ে গেছে, কি এক—মূক অশোয়াস্তি যে বে'রোবার পথ না পেয়ে শুধু আমার বুক জোড়া পাঁজরের প্রাচীরের ঘা দিয়ে বেড়াচ্চে। ক'দিন থেকে মাথাটা বোঁ-বোঁ ক'রে ঘুরচে আর মনে হচ্চে সেই সঙ্গে যেন দুনিয়ায় যত-কিছু আমার দিকে তাকিয়ে কেমন এক রকম এক কান্না কাঁদছে, আর সেই অকরুণ কান্না যতির মাঝে মাঝে একটা নির্ম্মম জিনের কাঠ-চোটা বিকট হাসি উঠছে হো—হো—হো ! সামনে তার নিঝুম গোরস্থানের মত 'সুম-সাম' হ'য়ে প'ড়ে

র'য়েছে আমাদের পোড়ো বাড়ীটা। তারই জীর্ণ দেওয়ালে অন্ধকারের চেয়েও কালো একটা দাঁড় কাক বীভৎস গলা ভাঙা স্বরে কাৎরাচ্ছে, 'খাঁ—আঃ—!—আঃ—!' দুপুর রোদ্দরকে ব্যথিয়ে ব্যথিয়ে তারই পাশের বাজ-পড়া' অশ্বত্থ গাছটায় একটা ঘুঘু করুণ-কণ্ঠে কূজন কান্না কাঁদ্‌চে, 'এস খুকু—উ—উ—উঃ!' বাদলের জুলুমে আমাদের অনেক দিনের অনেক স্মৃতি-বিজড়িত মাটির ঘরটা গলে' গলে' পড়চে,—দেখতে দেখতে সেটা একটা নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হ'য়ে গেল—চারি ধারে তার তেশিরে কাঁটা, মাঝে চিড়চিড়ে, আকন্দ, বোয়ান এবং আরো কত কি কাঁটা গুল্মের ঝোপ-ঝাড় তাদের আশ্রয় ক'রে ঘর বেঁধেচে বিছে, কেউটে সাপ, শিয়াল, খাটাস্—ওঃ, আমার মাথা ঘুরচে, আর ভাবতে পারিছিনে।......যখন মাথাটা বড্ডো দপ্ দপ্ ক'রতে থাকে আর তারই সঙ্গে এই বীরভূমের একচেটে ক'রে-নেওয়া 'ম্যালেরে' জ্বর (ম্যালেরিয়ার আমি এই বাঙলা নাম দিচ্ছি!) হু-হু করে' আসে তখন ঠিক এই রকমের সব হাজার এলো-মেলো বিশ্রী চিন্তা ছায়া-চিত্রের মত একটার পর একটা মনের ওপর দিয়ে চলে যায়। আজ তাই ভাই শোফিয়ারে! বড় দুঃখেই বাবাজিকে মনে করে' শুধু কাঁদ্‌চি—আর কাঁদ্‌ছি! খোদা যদি অমন ক'রে তাঁকে আমাদের মস্ত দুদ্দিনের দিনে ওপারে ডেকে না নিতেন, তা' হ'লে কি আজ আমাদের এমন ক'রে বাপ-দাদার ভিটে ছেড়ে পরের গলগ্রহ হ'য়ে 'অনহেলা'র ভাত গিল্‌তে হোত বোন্? আজ এই নিশীথ-রাতে স্তব্ধ মৌন-প্রকৃতির বুকে একা জেগে আমি তাই খোদাকে জিজ্ঞাসা করছি—নিঃসহায় বিহগ-শাবকের ছোট্ট নীড়খানি দুরন্ত বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে তাঁর কি লাভ? 'পাক্' তিনি, তবে একি পৈশাচিক আনন্দ র'য়েছে তাঁতে? হায় বোন, কে ব'লে দেবে সে কথা?

তুই হয়তো আমার এ সব 'পাকামো' 'বুড়োমী' শুনে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌বি, "মাগো মা! এত কথাও আসে এই পনের ষোল বছরের ছুঁড়ির। যেন সাতকালের বুড়ী আর কি!" কিন্তু ভাই, যাদের ছেলেবেলা হ'তেই দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষ হতে হয়, যাদের জন্ম হ'তেই টাল্ খেয়ে খেয়ে চোট্ খেয়ে খেয়ে বড় হ'তে হয়, তারা এই বয়সেই এতটা বেশী গম্ভীর আর ভাবপ্রবণ হ'য়ে উঠে যে, অনেকের চোখে সেটা একটা অস্বাভাবিক রকমের বাড়াবাড়ি ব'লেই দেখায়। অতএব যে জিনিসটা জীবনের ভেতর দিয়ে, নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করিস্‌নি, সেটাকে সমালোচনা ক'রতে যাস্‌নে যেন। যাক্ ওসব কথা!...

মা তাঁর বাপের বাড়ী ব'লে এখানে এসে এখন নতুন নতুন বেশ খুশীতেই আছেন। আমি জানি, তাঁর এ হাসি-খুশী বেশী দিন টিক্‌বে না। তবুও কিছু বলতে ইচ্ছে হয় না। আমার মনে সুখ নেই ব'লে অন্যকেও কেন তার ভাগী করব ? তা-ছাড়া চির-দুঃখিনী মা আমায় যদি তাঁর শোকসন্তপ্ত প্রাণে একটুখানি পাওয়া সান্ত্বনার স্নিগ্ধ প্রলেপ শুধু একটুক্ষণের জন্যেও পান, তবে তাঁর মেয়ে হ'য়ে কোন্ প্রাণে তাঁকে সে আনন্দ হ'তে বঞ্চিত ক'রব ? এ-ভুল ত দু'দিন পরে ভাঙবেই আপনি হ'তে। আর এক কথা, মায়ের খুশী হবার অধিকার আছে এখানে, কেননা এটা তাঁর বাপের বাড়ী। আর তারই উল্টো কারণে হ'য়েছে আমার মনে কষ্ট। অবশ্য আমিও নতুন জায়গায় (তাতে মামার বাড়ী) আসার ক্ষণিক আনন্দ প্রথম দু একদিন অন্তরে অনুভব ক'রেছিলাম, কিন্তু ক্রমেই এখন সে আনন্দের তীব্রতা, কর্পূরের উবে' যাওয়ার মত বড় সত্বরই উবে' যাচ্ছে। হোকনা মামার বাড়ী, তাই বলে' যে সেখানে বাবার বাড়ীর মত দাবী-দাওয়া চলবে, এ-ত হ'তে পারে না ! মানি, মামার বাড়ী ছেলেমেয়েদের খুবই প্রিয় আর লোভনীয় স্থান, কিন্তু যদি স্রেফ্ দু-চার দিনের মেহমান হ'য়ে শুভ পদার্পণ হয় সেখানে। যার মামার বাড়ীতে স্থায়ী বন্দোবস্ত ক'রে বা একটু বেশী দিনের জন্যে থেকেচেন, তাঁরাই এ কথার সারবত্তা বুঝতে পারবেন। অতিথি স্বরূপ দু-একদিন থেকে যাওয়াই সঙ্গত কুটুম্ব বাড়িতে। আমি এখানে অতিথি মানে বুঝি যাঁদের স্থিতি বড় জোর এক তিথির বেশী হয় না। যিনি অতিথির এই বাক্যগত অর্থের প্রতি সম্মান না রেখে শার্দ্দূলের লুব্ধা মাতৃস্বসার মত আর ন'ড়তেই চান না, তিনিত স-তিথি। আর, তাঁর ভাগ্যে সম্মানও ঐ বাঘের মাসী বিড়ালের মত চাটু আর হাতার বাড়ী, চেলাকাঠের ধুম্‌সুনী ! এঁরাই আবার অর্দ্ধচন্দ্র পেয়ে চৌকাঠের বাইরে এসে, আদর আপ্যায়নের ক্রটি দেখিয়ে বেইজ্জতীর ওজুহাতে চক্ষু দুটো উষ্ণ কটাহের মত গরম ক'রে গৃহস্বামীর ছোটলোকত্বের কথা তারস্বরে যুক্তি প্রমাণসহ দেখাতে থাকেন আর সঙ্গে সঙ্গে ইজ্জতের কান্নাও কাঁদেন। আহা ! লজ্জা করে না এ সব বেহায়াদের ? এ যেন "চুরি কে চুরি উল্টো সিনাজুরী !" থাক এ সব পরের 'নিন্দে'-চর্চ্চা, এখন বুঝছি, মেয়েদের এই "ধান ভান্‌তে শিবের গীত"—এক কথা বলতে গিয়ে আরো সাত কথার অবতারণা করা আর গেল না। কথায় বলে "খসলৎ যায় বলে।"—আমি বলছিলাম যে আমার মত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কেউ যদি মামাদের ঘাড়ে ভর করে' এসে, তবে সেখানে সে বেচারীর আব্দার ত চলেই না, স্নেহে-আদরের ও দাবী-দাওয়ার একটা সপ্রতিভ অসঙ্কোচ আর্জ্জিও পেশ করা যায় না। একটা বিষম সঙ্কোচ, অপ্রতিভ

হওয়ার ভয়, সেখানে কালো মেঘের মত এসে দাঁড়াবেই দাঁড়াবে। যার ভেতরে এতটুকু আত্ম-সম্মান-জ্ঞান আছে সে কখনই এ রকম ভাবে ছোট আর অপমানিত হ'তে যাবে না। ঐ কি বলে না, "আপনার ভিটেয় কুকুর রাজা।" কুকুরের স্বভাব হচ্ছে এই যে যত বড়ই শত্রু হোক্ আর পেছন দিকে হাঁটবার সময় নেজুড় যতই কেন নিভৃততম স্থানে সংলগ্ন করুক, যদি একবার যো-সো ক'রে নিজের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তবে আর যায় কোথা! আরে বাপ্‌রে বাপ্! অম্‌নি তখন তার বুক সাহসের চোটে দশহাত ফুলে ওঠে। তাই তখন সে তার লেজুড় যতদূর সম্ভব খাড়া করে' আমাদের বাঙালী পুরুষ পুঙ্গবদেরই মত তারস্বরে শত্রুকে যুদ্ধে আহ্বান ক'রতে থাকে, কিন্তু সেই এটাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, এমন বীরত্ব দেখাবার সময়ও অন্ততঃ অর্দ্ধেক শরীর তার দোরের ভেতর দিকেই থাকে আর ঘন ঘন দেখতে থাকে যে' তাড়া করলে খেঁচে-হাওয়া" দেবার মত লাইন ক্লিয়ার আছে কিনা। এই সারমেয় গোষ্ঠির মত আমাদের দেশের পুরুষদেরও এখন দুটি মাত্র অস্ত্র আছে, সে হ'চ্ছে ষাঁড়-বিনিন্দিত কণ্ঠের গগনভেদী চীৎকার আর মূলা-বিনিন্দিত বড় বড় দন্তের পূর্ণ বিকাশ আর খিঁচুনী! তাই আমরা আজো মাত্র দুই জায়গায় বাঙালীর বীরত্বের চরম বিকাশ দেখতে পাই; এক হচ্চে যখন এরা যাত্রার দলে ভীম সাজেন, আর দুই হচ্চে, যখন এঁরা অন্দর মহলে এসে স্ত্রীকে ধুম্‌সুনী দেন। হাঁ—আর এক জায়গায়,—যখন এঁরা মাইকেলী ছন্দ আওড়ান!...আর এঁরা এ-সব যে ক'রতে পারেন, তার একমাত্র কারণ, তাঁদের সে সময় মস্ত একটা সান্ত্বনা থাকে যে, যতই করি না কেন, এ হচ্চে 'হামারা আপ্‌না ঘর্!"

এইখানে আর একটা কথা ব'লে রাখি ভাই! আমার চিঠিতে এই যে কর্কশ নির্ম্মম রসিকতা নীরসতা আর হৃদয়হীন শ্লেষের ছাপ রয়েছে, এর জন্যে আমায় গালাগালি করিসনে যেন! আমার মন এখন বড় তিক্ত—বড় নীরস—শুষ্ক। সেই সঙ্গে অব্যক্ত একটা ব্যথায় জান শুধু ছট্‌ফট করছে। আর কাজেই আমার অন্তরের সেই নীরস তিক্ত ভাবটার ও হৃদয়হীন ছট্‌ফটানির ছোপ আমার লেখাতে ফুটে উঠবেই উঠবে—যতই চেষ্টা করি না কেন, সেটাকে কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারব না। এ রকম সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। এই দ্যাখ না, আমার মনে যখন যে ভাব আসচে বিনা দ্বিধায় অনবরত লিখে চলেচি,—কোথাও সংযম নেই, বাঁধন নেই, শৃঙ্খলা—'সিঞ্জিল' কিছু নেই,—মন এতই অস্থির, মন এখন আমার এতই গোলমেলে।

হাঁ, মামার বাড়ীর সকলে যেই জানতে পেরেছে যে আমরা খাসদখল নিয়ে তাঁদের বাড়ী উড়ে' এসে জুড়ে' বসার মত জড়, গেদে ব'সেচি, অমনি তাদের

আদর আপ্যায়নের তোড় দস্তুর মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এটাও স্বাভাবিক নতুন পাওয়ার আনন্দটা, নতুন পাওয়া জিনিসের আদর তত বেশী নিবিড় হয়, সেটা যত কম সময়ের জন্য স্থায়ী হয়। কারণ, নতুন ও হঠাৎ পাওয়া আনন্দেরও একটা পরিমাণ আছে আর সেই পরিমাণের তীব্রতাটা জিনিসের স্থিতির কালানুযায়ী কম-বেশী হ'য়ে থাকে। যেটার স্থিতিকাল মাত্র একদিন সে ঐ আনন্দের সমগ্র তীব্রতা ও উষ্ণতা একদিনেই পায়। যেটা দশদিন স্থায়ী সে ঐ সমগ্র আনন্দটা দশ দিনে একটু একটু ক'রে পায়। আমি এখন এই কথাটার সত্যতা হাড়ে হাড়ে বুঝচি। কারণ, অন্য সময় যখন এখানে এসেচি, তখন এই বাড়ীর সকলে উন্মুখ হ'য়ে থাক্‌ত কিসে আমাদের খুশী আদর সোহাগ ঠেসে দিত যে, তার কোথাও এতটুকু ফাক্ থাকবার যো ছিল না। তাই তখন মামার বাড়ীর নাম শুনলে আনন্দে নেচে উঠতাম। এখানে এসে দু-দিন পরে এখানটা ছেড়ে যেতেও কষ্ট হ'ত। মামানী, নানী, মামু, খালাদের কোল থেকে নামতে পেতাম না। গায়ে একটু আঁচড় লাগালে অন্ততঃ বিশ গুণ্ডা মুখে জোর সহানুভূতির 'আহারে। মেয়ে খুন হ'য়ে গেল!' ইত্যাদি কথা উচ্চারিত হ'ত। তাই ব'লে মনে করিসনে যেন যে, আজো আমি তেমনি ক'রে কোলে চড়ে' বেড়াবার জন্য উসখুস করছি, এখন আমি আর সে কচি খুকী নই। এখানকার মেয়েমহলের মতে—একটা মস্ত খুবড়ো ধাড়ি মেয়ে। এই রকম কত যে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হয় দিনের মাথায়, তার আর সংখ্যা নেই। আর, যেখানকার পৌণে ষোল আনা লোকের মুখে-চোখে একটা স্পষ্ট চাপা বিরক্তির ছাপ নানান কথায় কাজের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়, সেখানে নিজেকে কতটুকু ছোট ক'রে রাখতে হয়, জানটা কি রকম হাঁপিয়ে ওঠে সেখানে, ভাব দেখি। এ উপেক্ষার রাজভোগের চেয়ে যে ঘরের ডালভাত ভাল বোন। মামুজিরা আমায় খুবই স্নেহ করেন, কিন্তু তাঁরা ত দিন-রাত্তির ঘরের কোণে ব'সে থাকেন না যে সব শুনবেন। আমার তিনটি মামানী তিন কেসেমের তার ওপর আবার এক এক জনের চা'ল এক এক রকমের। কেও যান ছার্ত্তকে; কেও যান কদমে, কেও যান দুল্‌কি চা'লে। কথায় কথায় টিপ্পনী কিন্তু মামুজিদের ঘরে দেখলেই আমাদের প্রতি তাঁদের নাড়ীর টান ভয়ানক রকমের বেড়ে ওঠে, আমাদের পোড়া কপালের সমবেদনায় পেয়াজ কাট্‌তে কাট্‌তে বা উনুনে কাঁচা কাঠ দিয়ে অঝোর নয়নে কাঁদেন। মামুজিরা বাইরে গেলেই আবার মনের ঝাল ঝেড়ে' পূর্ব্বের ব্যবহারের সুদ শুদ্ধ আদায় করে' নেন। আমি ত ভাই ভয়েই শশব্যস্ত। তাঁদের এক একটা চাউনীকে যেন আমরা বরদাস্ত ক'রতে পারিনে, সকল কথা খুলে বলি মামুজিদের তারপর

আমাদের সেই ভাঙা কুঁড়েতেই ফিরে যাই। কিন্তু এতটুকু টুঁ শব্দ করতেই অমনি রং-বেরঙের গলায় মিঠেকড়া প্রতিবাদ ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। ঘরের আণ্ডাবাচ্চা মায় বাড়ীর ঝি পুঁটি বাগদী পর্য্যন্ত তখন আমার ওপর টীকা টিপ্পনীর বাণ বর্ষণ ক'রতে আরম্ভ করেন। এঁদের সর্ব্ববাদীসম্মত মত এই যে, থুবড়ো আইবুড়ো মেয়ের সাত চড়েরা বেরোবে না, কায়াটি ত নয়ই, ছায়াটি পর্য্যন্ত কেউ দেখতে পাবে না, গলার আওয়াজ টেলিফোন যন্ত্রের মত হবে, কেবল যাকে বলবে সেই শুনতে পাবে—বাস্। খুব একটা বুড়োটে' ধরনের মিচ-কেমারা গম্ভীর হ'য়ে পড়তে হবে, থুবড়ো মেয়ে দাঁত বের করে হাসলে নাকি কাপাস মহার্ঘ হয়! কোন অলঙ্কার ত নয়ই, কোন ভাল জিনিসও ব্যবহার করতে বা ছুঁতে পাবে না, তা হ'লে যে বিয়ের সময় একদম্ ছিরি' (শ্রী) উঠবে না। ঘরের নিভৃততম কোণে ন্যাড়া বোঁচা জড়-পুটুলি ঠুঁটো জগন্নাথ হ'য়ে চুপসে ব'সে থাক!—এই রকম সে কত কথা ভাই ওসব বারো ভজকট আমার ছাই মনেও থাকে না আর শুনতে শুনতে কানও ভোতা হয়ে গেছে। "কান করেছি ঢোল কত বোলবি বোল্!" তা ছাড়া একথা অন্যকে ব'লেই বা কি হবে? কেই বা শুন্‌বে আর কারই বা মাথা ব্যথা হয়েচে আমাদের পোড়াকপালীদের কথা শুনতে। খোদা আমাদের মেয়ে জাতটাকে দুঃখকষ্ট সহ্য করতেই পাঠিয়েছেন, আমাদের হাত-পা যেন পিঠমোড়া করে' বাঁধা, নিজে কিছু বলবার বা কইবার হুকুম নেই। খোদা-না-খাস্তা একটু ঠোঁট নড়লেই মহাভারত অশুদ্ধ আর কি। কাজেই, আছে আমাদের শুধু অদৃষ্টবাদ সব দোষ চাপাই নন্দ-ঘোষ স্বরূপ অদৃষ্টের ওপর। সেই মান্ধাতার আমলের পুরাণো মামুলী কথা, কিন্তু অদৃষ্ট বেচারা নিজেই আজ তর্ক অ—দৃষ্ট। আমাদের কর্ণধার মর্দ্দরা কর্ণ ধরে' যা করান তাই করি যা বলান তাই বলি। আমাদের নিজের ইচ্ছায় করবার বা ভাববার মত, কিছুই যেন পয়দা হয়নি দুনিয়ায় এখনো,—কারণ আমরা যে খালি রক্ত-মাংসের পিণ্ড। ভাত রেঁধে ছেলে মানুষ করে' আর পুরুষ দেবতাদের শ্রীচরণ সেবা করেই আমাদের কর্ত্তব্যের দৌড় খতম্। বাবা আদমের কাল থেকে ইস্তকনাগাদ নাকি আমরা ঐ দাসীবৃত্তিই করে' আসছি কারণ হজরত আদমের বাম পায়ের হাড্ডি হতে প্রথম মেয়ের উৎপত্তি। বাপরে বাপ। আজ সেই কথা টলবে? এ-সব কথা মুখে আনলেও নাকি জিভ খসে' পড়ে। কোন্ কেতাবে নাকি লেখা আছে, পুরুষদের পায়ের নীচে বেহেশ্‌ত, আর সে সব কেতাব ও আইন-কানুনের রচয়িতা পুরুষ দুনিয়ার কোন ধর্ম্মই ত আমাদের মত নারী জাতিকে এতটা শ্রদ্ধা দেখায়নি, এত উচ্চ আসনও দেয়নি, কিন্তু এদেশের দেখাদেখি আমাদের রীতি-নীতিও ভয়ানক সঙ্কীর্ণতা

আর গোঁড়ামী ভণ্ডামীতে ভ'রে উঠেছে। হাতে কলমে না ক'রে শুধু শাস্ত্রের দোহাই পাড়লেই কি সব হয়ে গেল?

আর শুধু পুরুষদেরই বা বলি কেন, আমাদের মেয়ে জাতটাও নেহাৎ ছোট হয়ে গেছে, এদের মন আবার আরও হাজার কেনেমের বেখাপ্পা বেয়াড়া আচার-বিচারে ভরা, যার কোন মাথাও নেই মুণ্ডুও নেই! এই ধর্ না এই বাড়ীরই কথা। ভয়ানক অন্যায় আর অত্যাচার যেটা, চির অভ্যাস মত সেটার বিরুদ্ধে একটু উচ্চবাচ্য করতে গেলেই অমনি গুষ্টিশুদ্ধ মেয়ের দঙ্গল আমার ওপর 'মারমূর্তি' হয়ে উঠবে আর গলা ফেড়ে চেঁচিয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে বলবে—"মাগো মা, মেয়ে নয় যেন সিঙ্গিচড়া ধিঙ্গি! এ যে জাঁদরের জাঁহাবাজ মরদের কাঁধে চড়ে' যায় মা! আমরা ত দেখে আসছি, সাত চড়ে খুবড়ো মেয়ের রা বেরোয় না, আর আজকালকার এই কলিকালের কচি ছুঁড়িগুলো—যাদের মুখ টিপলে এখনো দুধ বেরোয়, তাদের কিনা সব তাতেই মোড়লী সাওকুড়ী আর মুখের ওপর চোপা! মুখ ধরে' পুয়ে মাছের মত রগড়ে' দিতে হয়, তবে না থোতা মুখ ভোঁতা হয়ে যায়! আমাদেরও বয়েস ছিল গো, আজ নয় ত বুড়ী হয়েছি,—কই বলুক ত, কে বাপের বেটি আছে,—ছায়াটি পর্যন্ত দেখতে পেয়েছে। তাতে আর কাজ নেই। একটু জোরে কাশলেও যেন শরমে মরমে মরে' যেতাম' আর এখনকার 'খলিফা' মেয়েদের কথায় কথায় ফোঁপড়দালালী,—যেন অজ-বুড়ী! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!".. সময় কাটবে বলে ভাবিজীর কাছ হতে দু-চারটে বই আর মাসিকপত্র সঙ্গে এনেচি, এই না দেখে' এরা ত আর বাঁচে না! গালে হাত দিয়ে কত রকমেই না অঙ্গভঙ্গী করে, জানায় যে, রোজ্‌কেয়ামত এইবার একদম্ নিকটে। একটু পড়তে বসলে চারিদিক থেকে ছেলেমেয়ে বুড়ীরা সব উঁকি মেরে' দেখবে আর ফিস ফিস করে কত কি যে বলবে তার ইয়ত্তা নেই। আমি নাকি আমার বিদ্যে জাহির করতে তাদের দেখিয়ে বই পড়ি, তাই তারা রটনা করচে যে, আমি দুদিন বাদে মাথায় পাগ্‌ড়ী বেঁধে কাছা মেরে জজ ম্যাজিষ্টর হয়ে য্যা চেয়ারে ব'সবো গিয়ে; আমি ত এদের বলবার ধরণ দেখে আর হেসে বাঁচিনে। মেয়েদের চিঠি লেখা শুনলে ত এরা যেন আকাশ থেকে পড়ে! মাত্র নাকি এই কলিকাল, এরা বেঁচে থাকলে কালে আরও কত কি তাজ্জব ব্যাপারে চাক্ষুস দেখবেন। তবে এরা যে আর বেশী দিন বাঁচবেন না, এই একটা মস্ত সান্ত্বনার কথা। আমাদের এই ধিঙ্গী মেয়েগুলোই নাকি এদের জাতের ওপর খেমা খরিয়ে দিলে; এই সব ভেবে ভেবে ওদের রাত্তির বেলায় ভাল করে নিদ্ হয় না, আর তারই জন্যে তাদের অনেকেরই চোখে 'গগোল' পড়ে গেছে।—এইরকম সব অফুরন্ত মজার কথা—সে সব লিখতে

গেলে আর একটা 'গাজী মিঞারবস্তানী' বা মধু মিঞার দফ্তর হয়ে যাবে। তবু এতগুলো কথা তোকে জানিয়ে আমি আমার মনটা অনেক হাল্কা করে নিলাম। আমার শুধু ইচ্ছে করছে, তোর সঙ্গে বসে' তিন দিন ধরে এদের আরো কত কি মজার গল্প নিয়ে আলোচনা করি, তবে আমার সাধ মেটে। তাই যা মনে আসছে যতক্ষণ পারি লিখে যাই ত। কেন না, জানিনা আবার কখন কত দিন পরে এঁদের চক্ষু এড়িয়ে তোকে চিঠি লিখতে পারবো। এখনও মনের মাঝে আমার লাখো কথা জমে রইল। ডাকে চিঠি দিলাম না, তা হলে ত' লঙ্কাকাণ্ড বেধে যেত। তাই পত্র-বাহিকা এলোকেশী বাগদীর মারফতেই খুব চুপি চুপি চিঠি পাঠালাম। আমাদের গাঁয়ের ওপাড়ার মালকা বিবিকে মনে আছে তোর? ইনি সেই পাড়া-কুঁদুলী মাল্কা, যিনি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মেয়েদের সাথে ছেলেবেলায় কোঁদল করে বেড়াতেন। আমার এক মামাতো ভাইয়ের সাথে এঁর বিয়ে হয়েছে, তুই ত সব জানিস। এর ভাইয়ের নাকি বড্ডো ব্যামো তাই এলোকেশী ঝিকে খবর নিতে পাঠাচ্ছেন। তাঁকে বলেই এই চিঠিটা এমন লুকিয়ে পাঠাতে পারলাম। মাল্কা প্রায়ই আমার কাছে এসে অনেকক্ষণ ধরে 'গল্প করে' আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। বেচারী এখন বড্ডো সায়েস্তা হয়ে গেছে। তার মস্ত বড় সংসারের মস্ত ভার ঐ বেচারীর একা ঘাড়ে। ..চিঠিটা যত বড়ই হোক্ না কেন, আমি আজ আমার জমানো সব কথা জানিয়ে তবে ছাড়বো। দশ ফর্দ্দ চিঠি দেখে হাসিস্নে, বা এলে দিসনে যেন। এই চিঠি লিখতে ব'সে আর লিখে কি যে আরাম পাচ্চি, সে আর কি বলব। আমার মনের চক্ষে এখন তোর মূর্ত্তিটা ঠিক ঠিক ভেসে উঠেছে।

সত্যি বল্তে কি ভাই,—রাত্তির-দিন এই দাঁত-খিচুনী আর চিবিয়ে চিবিয়ে গঞ্জনা দেখে শুনে এই সোজা লোকগু'লোর ওপর বিরক্তি আসে বটে, তবে ঘেন্না ধরেনি। এদের দেখে মানুষের দয়া হওয়া উচিত। এর জন্য দায়ী কে?—পুরুষরাই ত আমাদের মধ্যে এইসব সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি ঢুকিয়ে দিয়েচেন। এমন কেউ কি নেই আমাদের ভেতর যিনি এই সব পুরুষদের বুঝিয়ে দেবেন যে আমারা অসূর্য্যম্পশ্যা বা হেরেম-জেলের বন্দিনী হ'লেও নিতান্ত চোর দায়ে ধরা পড়িনি। অন্ততঃ পর্দ্দার ভিতরেও একটু নড়ে' চড়ে' বেড়াবার দখল হ'তে খারিজ হয়ে যাইনি। আমাদেরও শরীর রক্ত-মাংসে গড়া; আমাদেরও অনুভব শক্তি, প্রাণ, আত্মা সব আছে। আর তা বিলকুল ভোঁতা হ'য়ে যায়নি। আজকাল অনেক যুবকই নাকি উচ্চশিক্ষা পাচ্চেন, কিন্তু আমি একে উচ্চশিক্ষা না বলে' লেখাপড়া শিখচেন বলাই বেশী সঙ্গত মনে করি। কেননা, এঁরা যত শিক্ষিত হচ্চেন, ততই যেন আমাদের দিকে অবজ্ঞায় হেকারতের দৃষ্টিতে দেখচেন

আমাদের মেয়ে জাতের ওপর দিন দিন তাঁদের রোখ চ'ড়েই যাচ্ছে। তাঁরা মহিষের মত গোঁয়ার্তুমী আরম্ভ ক'রে দিলেও কোন কসুর হয় না, কিন্তু দৈবাৎ যদি আমাদের আওয়াজটা একটু বেমোলায়েম হ'য়ে অন্তঃপুরের প্রাচীর ডিঙিয়ে পড়ে' তা হ'লে তারা প্রচণ্ড হুঙ্কারে আমাদের চৌদ্দ পুরুষের উদ্ধার করেন! ওঁদের যে সাত খুন মাফ! হায়! কে ব'লে দেবে এদের যে, আমাদেরও স্বাধীন ভাবে দুটো কথা বলবার ইচ্ছে হয় আর অধিকারও আছে, আমরাও ভালমন্দ বিচার ক'রতে পারি। অবশ্য, অন্যান্য দেশের মেয়ে বা মেম সাহেবদের মত মর্দ্দানা লেবাস পড়ে' ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে বেড়াতে চাই নে বা হাজার হাজার লোকের মাঝে দাঁড়িয়ে গলাবাজিও ক'রতে রাজিনই, আমরা চাই আমাদের এই তোমাদের গড়া খাঁচার মধ্যেই একটু সোয়াস্তির সঙ্গে বেড়াতে-চেড়াতে; যা নিতান্ত অন্যায়, যা তোমরা শুধু খামখেয়ালির বশবর্ত্তী হ'য়ে ক'রে থাক সেইগুলো থেকে রেহাই পেতে'! এতে তোমাদের দাড়ি হাসবে না বা মান-ইজ্জতও খোওয়া যাবে না, আর সেই সঙ্গে আমরাও একটু মুক্ত-নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচ্বো, রাত্তির দিন নানান্ আগুনে সিদ্ধ আমাদের হাড়ে একটু বাতাস লাগবে! তোমরা যে খাঁচায় পুরেও সন্তুষ্ট নও, তার ওপর আবার পায়ে হাতে গলায় শৃঙ্খল বেঁধে রেখেছ, টুঁটি টিপে ধরেছে,— থামাও, এ-সব জুলুম! তোমরা একটু উদার হও, একটু মহত্ত্ব দেখাও—এতদিনকার এইসব একচোখাঅত্যাচারের সঙ্কীর্ণতার খেসারতে এই এক বিন্দু স্বাধীনতা দাও,—দেখবে আমরাই আবার তোমাদের নতুন শক্তি দেব, নতুন করে' গড়ে' তুলব। দেশকাল পাত্র-ভেদে, যেটুকু দরকার' আমরা কেবল তাইই চাইছি, তার অধিক আমরা চাইবই বা কেন আর চাইলেই তোমরা দেবে কেন?...যাক্ বোন, আমাদের এসব কথা নিয়ে, অধিকার নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি ক'রতে গিয়ে কি "আয়রে বাঘ—না গলায় লাগ" এর মত কোন সমাজপতির এজলাসে পেশ হয় গিয়ে, অতএব এইখানেই এসব অবান্তর কথায় ধামাচাপা দিলাম।

আমার এই সব যা' তা' বাজে বকুনির মধ্যে বোধ হয় আমার বক্তব্যের মূল সূত্রটা ধরতে পেরেছিস। দিন-রাত্তির মনটা আমার খালি উড়ু উড়ু ক'রছে, অথচ মনের এ ভাব গতিকের রীতিমত কারণও খুঁজে পাচ্চিনে। এমন একটা সময় আসে, যখন মনটা ভয়ানক অস্থির হ'য়ে ওঠে.—অথচ কেন যে অমন হয়, কিসের জন্যে তার সে ব্যথিত ছট্‌ফটানি, তা প্রকাশ করা ত দূরের কথা, নিজেই ভাল করে' বুঝে উঠা যায় না! সে বেদনার কোথায় যেন তল, কোথায় যেন তার সীমা! অবশ্য রেশ কাঁপছে তার মনে, কিন্তু সে কোন্ চিরব্যথার অচিন্-বন খারিয়ে আসছে এ রেশ, আর কোন অনন্ত আদিন বিরহীর বাঁশের বেদনে ঝঙ্কার

পেয়ে ? হায় তা কেউ জানে না ! অনুভব ক'রবে কিন্তু প্রকাশ ক'রতে পারবে না !...আমার এ রকম মন খারাপ হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে ব'লবে তুমি, কিন্তু ভাই, আমি যে-কোন-লোকের মাথায় হাত দিয়ে ব'লতে পারি যে, সে সব মামুলী ব্যথা-বেদনার জন্যে অন্তরে এমন দরদ আসতেই পারে না। এ যেন কেমন একটা মিশ্র বেদনা গোছের ; জানের অনাচার ভাব, মরমের নিজস্ব মর্ম্মব্যথা যা মনেরও অনেকটা অগোচর। একটা কথা আমি ব'লতে পারি,— যিনি যতই মানব-চরিত্রের ঘুণ হন, তিনি নিশ্চয়ই নিজের মনকে পুরোপুরি ভাবে বুঝতে পারেন না। স্রষ্টার এইখানেই মস্ত সৃজন-রহস্য লুকানো র'য়েচে। আর এ আমাদের মনের চিরন্তর দুর্ব্বলতা,—একে এড়িয়ে চলা যায় না !...আহ ! আহ !! দাঁড়া বোন,—আবার আমার বুকে সে-কোন আমার চির-পরিচিত সাথীর তাড়িয়ে দেওয়া চপল-চরণের ছেঁড়া-স্মৃতি মনের বনে খাপছাড়া মেঘের মত ভেসে উঠছে ! সে কোন অজানার কান্না আমার মরমে আস্ত প্রতিধ্বনি তুলছে ! দাঁড়া ভাই একটু পানি খেয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে তবে লিখবো। কেন হয় ভাই এমন ? কেন বুকভরা অতৃপ্তির বিপুল কান্না আমায় মাঝে এমন ক'রে গুমরে ওঠে ? কেন ?---আঃ খোদা !

* * * *

বাহা রে ! চিঠিটা শেষ না ক'রেই দেখচি দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম !

হ্যাঁ—এখন, ভাবিজীকে বলিস, যেন ও-মাসের আর এ-মাসের সমস্ত মাসিক পত্রিকাগুলো এরই হাতে পাঠিয়ে দেন। ভুললে চ'লবে না ! আর, তাঁকে ব'লবি, যেন আমায় মনে করে চিঠি দেন। সকলকে চিঠি লিখবার সময় কই, আর সুবিধাই বা কোথা ? নৈলে সকলকে আলাদা আলাদা চিঠি দিতাম। তুই ওদের সব কথা বুঝিয়ে বলবি, যেন কেউ অভিমান না করেন ! আমি কাউকেই ভুলিনি। সবাই যেন আমায় চিঠি দেন কিন্তু—হ্যাঁ আমার মতন তাঁদের ত এ রকম জিন্দান কুঁয়ায় পড়ে থাকতে হয় নি ? কাজেই কারুর আর কোন ওজর শুনছি নে। ভাবিজী, ভাইজী, মা সবাই আমায় আর মনে করেছে কি ?—তারপর, এ সব ত হ'ল, এখনো যে আদত মানুষটি বাকী ! আমার পিয়ারের খুকুমণি 'আনার-কলি' কেমন আছে ? এখানে কোন ছেলেমেয়ে দেখলেই আমার খুকুরাণীর কথা মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে চোখও ছল ছল ক'রে উঠে, আমার এই দুর্ব্বলতায় আমার নিজেরই কত লজ্জা পায়। কারণ তোরা হয় ত মনে করবি এ একটা বাড়াবাড়ি। ঐ এক টুকরো ছোট মেয়েটাকে আমি যে কত ভালোবেসেছি, তা তোরা বুঝবি কি ছাইপাশ ? কথায় বলে, "বাঁজায়

জানে ছেলের বেদন !" অবিশ্যি আমি যদিচ এখনো তোদেরই মত ন্যাড়া বোঁচা কিন্তু আমার মন ত আর বাঁজা নয় ! এরই মধ্যে তোর গোলাবী গাল হয় ত শরমে লাল হ'য়ে গেছে ! কিন্তু রোস, আরো শোন ! মনে কর, আমি যদি বলি যে, আমার নিজের একটা মেয়ে থাকলে আমি ভাবিজীর সঙ্গে অদল-বদল ক'রতাম, তা হ'লে তুই বিশ্বাস করিস ? দাঁড়া, এখনই ধেই ধেই ক'রে খেম্‌টাওয়ালীদের মত নেচে দিসনে যেন রাগের মাথায় ; আরো একটু শুনে যা —সত্যি বলতে কি শোফি, আমারও একটি ঐ রকম ছোট্ট আনার কলির মা হ'তে বড্ডো সাধ হয় ! কথাটা নিশ্চয় তোর মতন চুলবুলে "লাজের মাসুদ" এর কাছে কাঁচা ছুঁড়ির মুখে পাকা বুড়ীর কথার মত বেজায় বেখাপ্পা শুনালো, না ? বুঝবি লো, তুইও বুঝবি দু-দিন বাদে আমার এই কথাটা । এখন শরমে তোর চোখ-মুখ লাল হ'য়ে উঠছে, গোস্বায় তোর পাৎলা রাঙা ঠোঁট ফুলে ফুলে কাঁপছে (আহা, ঠিক আমের কচি কিশলয়ের মত !) কিন্তু এই গায়েবী খবর দিয়ে রাখলাম, এ গরীবের কথা বাসি হ'লে ফ'লবেই ফ'লবে ! মেয়েদের যে মা হবার কত বেশী সখ আর সাধ, তা মিথ্যা না ব'ললে কেউ অস্বীকার ক'রবে না ! কি একটা ভালো বইয়ে প'ড়েছিলাম যে, আমাদেরই মা আমাদের মধ্যে বেঁচে র'য়েছেন ! তলিয়ে বুঝে দেখলে কথাটা সুন্দর সত্যি আর স্বাভাবিক বোধ হয় ।—হাঁ, কিন্তু দেখিস ভাই লক্ষ্মীটি, তোর পায়ে পড়ছি, ভাবিজীকে এ সব কথা জানতে দিসনে যেন । শ্রীমতী রাবেয়া যাঁর নাম, তিনি যে এ সব কথা শুনলে আমায় সহজে ছেড়ে দেবেন, তা জিবরাইল এসে ব'ললেও আমি বিশ্বাস ক'রব না । একে ত দুষ্টু বুদ্ধিতে তিনি অজেয়, তার ওপর একাধারে তিনি আমার গুরু বা ওস্তাদ আর ভাবিজী সাহেবা ! (সেই সঙ্গে রামের সুগ্রীব সহায়ের মত তুমিও পিছনঠেলা দিতে কি কসুর ক'রবে ?) নানাদিক দিয়ে দেখে আমি চাই যে, আমার সব কিছু যেন চিচিং-ফাঁক না হ'য়ে যায় ! কেন না এ হ'চ্ছে স্রেফ্ তোতে আমাতে দু-সই-এ সই-এ গোপন কথা ! এখানে বাজে লোকের প্রবেশ নিষেধ !

এতটা বেহায়াপনা ক'রে সাত কালের বুড়ী মাগীর মত এত কথা এমন ক'রে খুলে কি ক'রে লিখতে পারলাম দেখে হয় ত তুই, "আই—আই—গালে কালি মা !" ইত্যাদি অবাক বিস্ময়বাণী উচ্চারণ ক'রচিস ; কিন্তু লিখতে ব'সে দেখবি যে, মেয়েতে মেয়েতে (তার ওপর আবার তারা আমার মত সই হ'লে আর দূর দেশে থাকলে ত কথাই নেই ।) যত মন খুলে সব কথা অসঙ্কোচে ব'লতে বা লিখতে পারে' অমন কেউটা আর পারে না । পুরুষেরা মনে করে, তাদের বন্ধুতে ব'সে যত খোলা কথা হয়, অমন বোধ হয় আমাদের মধ্যে

হয় না ; কিন্তু তারা যদি একদিন লুকিয়ে মেয়েদের মজলিসে হাজিরা দিতে পারে, তা হ'লে তারা হয়ত সেইখানেই মেয়েদের পায়ে গড় ক'রে আসবে। ও-সব কথা এখন যেতে দে, কিন্তু আমি ভাই সত্যি সত্যিই মনের চোখে দেখছি তুই এতক্ষণ লাফিয়ে চিল্লিয়ে তোর সেই বাঁধা বুলিটা আওড়াচ্ছিস, "মাহবুবাকে বই পড়িয়ে পড়িয়ে ভাবিজী একদম লজ্ঝর ক'রে তুলেচেন।" আর সেই সঙ্গে আমার দুঃখও হচ্চে এই ভেবে যে, তুই এখন আর কাকে আঁচড়াবি কামড়াবি ? পোড়া কপাল, বরও জুটলো না এখনো যে, বেশ এক হাত হাতাহাতি খামচা-খাম্‌চি লড়াইটা দেখেও একটু আমোদ পাই। আল্লারে আল্লাহ ! আমাদের এই তথাকথিত শরীফের ঘরে শুধু বুড়ি ঝুড়ি থুবড়ো ধাড়ি মেয়ে ! বর যে কোথা থেকে আসবে, তার কিন্তু ঠিক-ঠিকানা নেই !—

তারপর, আমি চ'লে আসবার পর খুকী আমায় খুঁজেছিল কি ? আমার কেবলই মনে হ'চ্চে, যেন খুকী খুব বায়না ধ'রেছে, মাথা কুটে হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদচে, আর তোরা কেউ এই দুলালী আবদেরে প্রাণীটির জিদ থামাতে পারছিসনে। আমায় দেখলেই কিন্তু কান্নার মুখে পূর্ণ এক ঝলক হাসি ফুটে উঠত এই মেয়ের মুখে- ঠিক ছিন্ন মেঘের ফাঁকে রোদ্দুরের মত ! কেন অমন হোত জানিস ? আমি মানুষ বশ করার ওষুধ জানি লো ওষুধ জানি। বশ করতে জানলে অবাধ্য জানোয়ারকে বশ করাই সব চেয়ে সহজ !

আরো কত কথা মনে হ'চ্চে, কিন্তু লিখে শেষ করতে পারচিনে। তা ছাড়া একটা কথা লিখবার সময় আর একটা কথার খেই হারিয়ে ফেলচি। মনের ধৈর্য্যের দরকার এখানে ! কিন্তু হায়, মন যে আমার ছট্‌ফটিয়ে ম'রচে। ঘুমই গিয়ে এখন, ভোর হ'য়ে এল। কেউ কোথাও জাগেনি, কিন্তু একটা পাপিয়া "চোখ গেল, উহু চোখ গেল" ক'রে চেঁচিয়ে ম'রচে। কে তার এই কান্না শুনছে তার সে খবরও রাখে না।

খুব বড় চিঠি না দিস যদি, তা হ'লে আমার মাথা খাস। বুঝলি ?

তোর "কলমি লতা"—

মাহবুবা

পুনশ্চ—

নুরুল হুদা ভাইজির কোন খবর পেয়েছিস কি ? তিনি চিঠিতে কি-সব কথা লেখেন ? মাহবুবা

সালার
১৩ই ফাল্গুন

সই মাহবুবা।

এলোকেশী দূতীর মারফৎ তোর চিঠিটা পেয়ে যেন আমার মস্ত একটা বুকের বোঝা নেমে গেল। বাসরে বাস্। এত বড় দস্যি মেয়ে তুই। কি ক'রে এতদিন চুপ ক'রে ছিলি? জানটা যেন আমার রাত-দিন আই-ঢাই ক'রত। এখন আমার মনে হচ্চে যেন আসমানের চাঁদ হাতে পেলাম। যেদিন চিঠিটা পাই, সেদিনকার রগড়টা শোন আগে। তার পর সব কথা ব'লচি।—পরশু বিকেলে তোর ঐ বিন্দে দূতী মহাশয়া যখন আমাদের বাড়ীর দোরে শুভ পদার্পণ ক'রছেন, তখন দেখি, এক পাল দুষ্ট ছেলে তার পিছু নিয়েছে আর স্বর-বেস্বরের আওয়াজে চীৎকার ক'রচে, "আকাশে সরষে ফোটে, গোদা ঠ্যাং লাফিয়ে ওঠে।" আর বাস্তবিকই তাই—ছেলেদেরই বা দোষ কি। বুড়ীর পায়ে যে সাংঘাতিক রকমের দুটো গোদ, তা দেখে আমার আর হাসি থামে না। আমার সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগলো যে, আলবোর্জ্জ-পাহাড়ধ্বংসী রুস্তমের গোর্জ্জের মত এই মস্ত ঠ্যাং দুটো ব'য়ে এই মান্ধাতার আমলের পুরানো বুড়ী এত দূর এল কি ক'রে? ভাগ্যিস বোন, ভাইজি তখন দলিজে বসে' এসরাজটা নিয়ে ক্যাঁ ক্যা করছিলেন, নৈলে এসব পাখোয়াজ ছেলেরা বুড়ীকে নিশ্চয়ই সে দিন "কীচকবধ" করে' দিত। মাগী রাস্তা চলে' যত না হয়রান হ'য়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী পেরেশান হ'য়েছিল ঐ ছ্যাঁচড়া ছেলে-মেয়ের দঙ্গলকে সপ্তস্বরে পূর্ণ বিক্রমে গালাগালি করাতে আর ধূলা-বালি ছুঁড়ে' তাদের জব্দ ক'রবার বৃথা চেষ্টায়। ঘরে এসে যখন সে বেচারী ঢুকলো, তখন তার মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে, ভিজে ঢাক্কের মত গলা বসে' গেলে! ভাবিজী তাড়াতাড়ি তাকে শরবৎ করে' ছেন, মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢেলে তেল দিয়ে পাখা করে' দেন, তবে তখন বেচারীর ধড়ে জান্ আসে! ওর সে সময়কার অবস্থা দেখে আমার এত মায়া হ'তে লাগলো! কিন্তু কি করি, আমি ত আর বেরোতে পারিনে ভাই, কেউ আর আমায় অচেনা লোকের কাছে বের হ'তে দ্যায় না। ভাইজান্ বলেন বটে, কিন্তু তাঁর কথা কেউ মানে না। ও নিয়ে আমি কত কেঁদেছি, ঝগড়া করেছি ওঁদের কাছে। লোকে আমায় দেখলে বোধ হয় আমার 'উচকপালী' 'চিরুণ-

দাঁতী'র কথা প্রকাশ হ'য়ে প'ড়বে! না? যাক,—আমি প্রথমে ত তাকে দেখে জানতে পারিনি যে, সে তোদের শাহপুর থেকে আসছে। পরে ভাবিজীর কাছে শুনলাম যে সে তোদের ওখান থেকে জবরদস্ত একখানা চিঠি নিয়ে এসেছে। ভাবিজী প্রথমে ত কিছুতেই চিঠি দিতে চান না, অনেক কাড়াকাড়ি করে' না পেরে শেষে যখন জানলাটায় খুব জোরে মাথা ঠুকতে লাগলাম আর ভাইজান এসে ওঁকে খুব এক ছোট বকুনী দিয়ে গেলেন তখন উনি রেগে চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আমার দিকে। আমার তখন খুশী দেখে কে! রাগলেনই বা, ওঃ, উনি রাগলে আমার ব'য়েই গেল আর কি! তাই বলে' আমার চিঠি ঐ সব বেহায়া ধাড়ীকে প'ড়তে দিই'—আবদার! এই সব কসহ-কেজিয়া ক'রতেই সাঁঝ হ'য়ে এল। তাড়াতাড়ি বাতি জ্বালিয়ে দোর বন্ধ ক'রে তোর চিঠিটা প'ড়তে লাগলাম। প্রথম খানিকটা পড়ে' আর প'ড়তে পারলাম না। আমারও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আসছিল। আচ্ছা ভাই 'কলমি-লতা'! তুই মনে ভাবচিস হয় ত যে, আমি এখানে খুবই সুখে আছি। তা নয় সই, তা নয়। তোকে ছেড়ে' আমার দিনগুলো যে কি রকম ক'রে কাটছে, তা' যদি তুই জান্‌তিস, তা হ'লে এত দুঃখেও তোর আমার জন্যে কষ্ট হোত। আমি যে তোদের ঐ শূন্যপুরী ঘরটার দিকে তাকালেই কেঁদে ফেলি বোন! আমাদের ঘরের সব কিছুতেই যে তোর ছোঁওয়া এখন লেগে' র'য়েছে। তাই মনে হয়, এখানের সকল জিনিসই তোকে হারিয়ে একটা মস্ত শূন্যতা বুকে নিয়ে হা-হা করে কাঁদছে। সেই সঙ্গে আমারও যে বুক ফেটে যাবার যো হ'য়েছে; পোড়া কপাল তোর! মামার বাড়ীতেও এই হেনস্থা, অবহেলা! যখন যার কপাল পোড়ে, তখন এমনই হয়। তোর পোড়ারমুখী আবাগী মামানীদের কথা শুনে রাগে আমার গা গিসগিস্ ক'রেছে। ইচ্ছে হয়, এই জাতের হিংসুটে মেয়েগুলোর চুল ধরে' খুব কসে' শ'খানিক দুমাদ্দুম কিল বসিয়ে দিই পিঠে, তবে মনের ঝাল মেটে! জানি, ও দেশের মেয়েরা ঐ রকম কুঁদুলে হয়। দেখছিস ত, ও-পাড়ার শেখদের বৌ দুটো? বাপরে বাপ, ওরা যেন চিলের সঙ্গে উড়ে ঝগড়া করে! মেয়ে ত নয়, যেন কাহারবা! তোদের কথা শুনে মা, ভাবিজী, ভাইজান কত আফ্‌সোস ক'রতে লাগলেন। তোদের উঠে যাবার সময় মা এত করে' বুঝালেন তোর মাকে, তা খালাজি কিছুতেই বুঝলেন না। কেন বোন এও ত তাঁরই বাড়ী। মা-জান সেদিন তোদের কথা ব'লতে ব'লতে কেঁদে ফেললেন, আর কত আরমান ক'রতে লাগলেন যে, আমি ত তাদের নিজের ক'রতে চাইলমে, আর জানতামও চিরদিন নিজের ব'লেই, তা তারা আমাদের এ দাবীর ত খাতির রাখলে না। মাহবুবাকে ত নিজের বেটীই মনে

ক'রতাম, তা' ওর মা ওকেও আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। কি করি, জোর ত নেই।...এই রকম আরো কত আক্ষেপের কথা। এখানে ফিরে আসবার জন্যে মাও ফের চিঠি দেবেন খালাজিকে, আজ ঐ নিয়ে ভাইজানের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তোর পায়ে পড়ি ভাই, তুই যেন কোন ল্যাঠা লাগাসনে আর ওরই সাথে। বরং খালাজিকে বুঝিয়ে বলিস, যাতে তিনি থির হ'য়ে সব কথা ভাল করে' বুঝে দেখেন। সত্যি করে' বলছি ভাই, তোকে ছেড়ে' থাকলে আমি একদম ম'রে যাব। এই ক'দিনেই আমার চেহারা কি রকম শুকিয়ে গেছে, তা' যদি আস্‌সিস্, তখন নিজে দেখবি। ভাইজান ব'লছিলেন, তিনি নিজেই যাবেন পাল্কি নিয়ে তোদের আনতে। তাই আমার কাল থেকে এত আনন্দ হ'চ্ছে, সে আর কি ব'লব। এখন এ ক'দিন ধরে' যে তোর জন্যে খুবই কান্নাকাটি ক'রেছিলাম, তা' মনে হয়ে আমার বড্ডো লজ্জা পাচ্চে। সত্যি সত্যিই, ভাবিজী যে বলেন, আমার মত ধাড়ী মেয়ের এত ছেলে-মানুষী আর কাঁদাকাটা বেজায় বাড়াবাড়ি, তাতে কোনও ভুল নেই। এখন তুই ফিরে আয় ত তারপর দেখবো। তোর ঐ এক পিঠ চুলগুলো ধরে' এবার আর রোজ রোজ বেঁধে দিচ্চি নে, মনে থাকে যেন। থাকবি রাত্তির-দিন ঐ সেই বই-এ পড়া কপাল-কুণ্ডলার মত এলো চুলে। তুই যাবায় পর থেকে গল্প ক'রতে না পেরে জানটা যেন হাঁপিয়ে উঠছে আমার। মর পোড়া-কপালীরা, কেউ যদি গল্প ক'রতে চায়। সারাক্ষণই ছাই-পাঁশ কাজ নিয়ে ব্যস্ত। মাগো মা। এই রকম গুম্ হ'য়ে ব'সে থাকলে ত আমার মতন লোকের আর বাঁচাই হয় না দুনিয়ায়। মা ত আর ও-সব ছেলে-মানুষী ভালো বাসেন না। ভাবিজীও যত সব ছাই-ভস্ম রাজ্যের বই আর মাসিক পত্রিকার গাদায় ডুবে থাকেন। নিজে ত মরেছেন, আবার আমাকেও ঐ রকম হ'তে বলেন। কথা শুনে' আমার গা পিত্‌পিতিয়ে ওঠে। পড়্‌বি বাপু ত এক আধ সময় পড় দিনের একটু আধটু কাজের ফাঁকে, তা না হ'য়ে রাত্তির জেগে বই পড়া। অমন বই-পড়ার মুখে নুড়োর আগুন জ্বালিয়ে দিই আমি। আমার তো ভাই দুটো গল্প পড়বার পরই যেন ছট্‌ফটানি আসে, মাথা ধরবার জোগাড় হয়। তার চেয়ে ব'সে ব'সে দু-ঘণ্টা গল্প ক'রব যা কাজে আসবে। এই কথাটি ব'ললেই আমাদের মুরুব্বি ভাবিটি হেসেই উড়িয়ে দেন। তার পর, বুঝেছিস রে, আমাদের এই ভাবিজী আবার কবিতা গত্ত লিখতে শুরু করে' দিয়েছেন রাত্রি জেগে। আমি সেদিন হঠাৎ তাঁর একটা ঐ রকম খাতার আবিষ্কার ক'রেছি। ওসব ছাই ভস্ম কিছুই বুঝতে পারা যায় না, শুধু হেঁয়ালি। তবে, আমাদের

খুকীকে নিয়ে যে সব কবিতাগুলো লেখা, সেগুলো আমার খুব ভালো লেগেছে। এখন দেখছি, এই লোকটিকে রীতিমত আদর ক'রে চলতে হলো।

তারপর 'আনারকলি'র কথা বলি, শোন! আমার এই ক্ষুদে' ভাইঝিটিই হ'য়েছে আমার একমাত্র সাথী। ও ছাড়া বাড়ীর আর কারুর সঙ্গে বনে না আমার। গল্প করায় কিন্তু খুকী আমাকেও হা'র মানিয়েছে। এই কচি খুকিটি যেন একটা চঞ্চল ঝরণা। অনবরত ঝরঝর ঝরঝর ব'কেই চলেচে। আর সে বকার না আছে মাথা না আছে মণ্ডু। এখন দায়ে প'ড়ে, ওর ঐ সব হিজিবিজি কথাবার্ত্তাই আমাকে অবলম্বন করতে হ'য়েছে আর ক্রমে ভালোও লাগছে। তুই চ'লে যাবার পর সে "ফুপুদি দাবো ফুপুদি দাবো" ব'লে দিন কতক যেন মাথা খুঁড়ে মরেছিল, এখনও সময় সময় জিদ ধ'রে বসে। যখন "না,—ফুপুদি দাবো' ব'লে এ খাম্‌খেয়ালী মেয়ে জিদ ধরে, তখন কার সাধ্যি যে থামায়। যত চুপ ক'রতে ব'লব, তত সে চিঁচিয়ে চিল্লিয়ে গড়াগড়ি দিয়ে ধুলো-কাদা মেখে একাকার ক'রবে। বাড়ীশুদ্ধ লোক মিলে তাকে থামাতে পারে না। কোন দিন গল্প ক'রতে ক'রতে বা আবল তাবল ব'কতে ব'কতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ঘাড়টা কাৎ ক'রে বলে, "আমাল ফুপু নেই — ম'লে গেছে!" সঙ্গে সঙ্গে মুখটা তার একটুকু, চুণ হয়ে যায় আর একটি ছোট্ট নিশ্বাসও পড়ে, আমার জান্‌টা তখন সাত পাক মোচড় দিয়ে ওঠে বোন। ভাবিজীর চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়ে আমি তাকে সেদিন যখন জানিয়ে দিলুম যে তাঁর লাল ফুফু সাহেবা মামুবাড়ী সফর ক'রতে গেছেন, তখন থেকে লাল ফুপুর আল্লাদী দরদী এই ভাইঝিটা হাততালি দিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচে আর বলে'—তাই তাই তাই, মামা বালি দাই, মামী মাল্ডী ভাত দিলে না দোরে হেদে পালাই!" তোর চিঠিতে এই যে পেন্সিলের দাগগুলো দেখছিস্‌, এগুলো এই দুষ্টু মেয়েরই কাটা। আমি যখন চিঠি লিখতে বসি, তখন সে আমার ঘাড়ে চ'ড়ে পিঠে কিল মেরে জোর আপত্তি করতে শুরু ক'রে দিল, সে কিছুতেই আমায় চিঠি লিখতে দেবে না, এখন তাকে ছবি দেখাও। তারপর যেই বলা যে, এ চিঠি তাঁরই প্রিয় মাননীয়া লাল ফুপু সাহেবার; তখন সে ঝোঁক নিলে, "আমি তিথি লিখবো ফুপুদিকে!" ভাল জ্বালা বোন, সে কি আর থামে! কি করি, নাচার হ'য়ে একটা ভোতা পেন্সিল তার হাতে দিয়ে দুলালীর মান রক্ষে করা গেল, না দিলে সে চিঠিটা ছিঁড়ে কুটি কুটি ক'রে দিত, যে মেয়ের রাগ। এই মেয়েটা কী পাকা বুড়ী বোন, তোর চিঠিটা হাতে করে সে মুখকে মাল্‌সাব মত গম্ভীর ক'রে আধ ঘন্টা খানিক ধ'রে যা তা ব'কতে লাগলো আর পেন্সিলটা

যেখানে সেখানে বুমিয়ে প্রমান কর্‌তে লাগলো যে' সেও লেখা জানে ! আমার ত আর হাসি থামে না। হাসলে আবার তিনি অপমান মনে করেন কি না; কারণ তাঁর আত্মসম্মানবোধ এই বয়সেই ভয়ানক রকম চাগিয়ে উঠছে, তাই তাঁর কাণ্ড দেখে হাসলে তিনি একেবারে তেলে বেগুণে জ্ব'লে ওঠেন। ঠোঁট ফুলিয়ে, কেঁদে কেটে খাম্‌চিয়ে কামড়িয়ে একেবারে তছ্‌-নছ্‌ ক'রে ফেলবে। এই চিঠি লেখবার সময়ও চিঠি ঐ রকম জোগাড় হ'য়েছিল, হয় ত আজকে আর এটা লেখাই হ'ত না—ভাগ্যি সেই সময় আমাদের সেই ধেড়ে বেড়ালীটা তার নাদ্‌স্‌ নুদুস্‌ বাচ্চা চারটে নিয়ে সপরিবারে আমার কামরায় দুর্গতিনাশিনীর মত এসে হাজির হ'ল তায় রক্ষে। নৈলে হয়েছিল আর কি! বেড়াল-ছানাগুলো দেখে খুকী একেবারে আত্মহারা হ'য়ে সব ছেড়ে তার পেছন পেছন দে ছুট্‌। শ্রীমতী বিড়ালগিন্নী সে সময়ের মত সে স্থান থেকে অন্তর্দ্ধান হওয়াই সমীচীন বোধ ক'রলেন। খুকী বেড়াল বাচ্চাগুলোর কানে ধ'রে ধরে বুঝাতে চেষ্টা করে যে সে ঐ বাচ্চা চতুষ্টয়ের মাসী-মা বা খালাজি। অবশ্য, বাচ্চাগুলো বা তাদের মা প্রকাশ্যে এর বিরুদ্ধে কিছু মত প্রকাশ করতে সাহস করেনি। উল্টে খুকী যখন তাদের কান ধ'রে ঝুলিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "পুছু, আমি—আমি তোল খালাজি ! না ? বেচারী বেড়াল বাচ্চা তখন করুণ সুরে ব'লে ওটে "মিউ !" অর্থাৎ না স্বীকার ক'রে করি কি ? এই গরীব বাচ্ছাগুলির ওপর খুকীর আমাদের যে মাসীর মতই নাড়ীর টান টন্‌টনে সে বিষয়ে আমার আর এই গরীব বেচারীদেরও ঘোর সন্দেহ আছে। মার্জ্জার পত্নী মহাশয়া ত সেটা স্বীকার ক'রতে একদম নারাজ, তবু সন্তান বাৎসল্য অপেক্ষা যে লাঠির বাড়ির গুরুত্ব অনেক বেশী, তা বিড়ালীর বিলক্ষণ জানা আছে, তাই তার বুবু সাহেবা অর্থাৎ কিনা আমাদের খুকুমণি সেখানে এলেই সে ভয়ে হোক নির্ভয়ে হোক— সে স্থান ত্যাগ করে ! খুকুও তখন বাচ্চাগুলোকে টেনে হিঁচড়ে চাপড়িয়ে লেজ দুমড়ে, কান টেনে যে রকম নব নব আদর আপ্যায়ন দেখায়, তা দেখে "মা মরে মাসি ঝুরে" কথাটা একদম ভুয়ো ব'লে মনে হয়।...আমি বোন কিন্তু এ সব পারিনে। এই সব অনাছিষ্টি, বেড়ালছানা নিয়ে রাত্তির দিন ঘাঁটাঘাঁটি হতভাগ্য ছেলেপিলের যেন একটা উৎকট ব্যামো। এই বেড়ালছনোগুলোর গায়ে এত পোকা ছুঁতেই ঘেন্না করে তাকে নিয়ে এই দুলালী মেয়ে সারাক্ষণই ঘাঁটবে নয়ত কোলে ক'রে এনে বিছানায় তুলবে। সেদিন দেখি,—ছি, গাটা ঝাঁকারে উঠছে ! ওর গা বেয়ে ঝাঁকড়া চুলের ভিতর ঢুকছে কত বেড়াল পোকা। ওর মা ত রাগের চোটে ওকে ধুমসিয়ে একাকার ক'রে ফেললে। আমি শেষে কত কষ্টে গা ধুইয়ে চুল আঁচড়িয়ে পেকোগুলো বের ক'রে দিলাম। আর এই

হারামজাদা বেড়ালছানাগুলোও তেমনি খুকিকে দেখলেই ওদের বোনঝির নাড়ীতে টনক দিয়ে ওঠে, আর তাই লেজুড় খাড়া করে সকরুণ মিউ মিউ সুরে ওদের এই মানুষ খালাটীর কাছে গিয়ে হাজির হবে। রাগে আর ঘেন্নায় আমার গা হেলফিলিয়ে ওঠে এইসব জুলুম দেখে। অন্য কেউ এই বাচ্চাগুলোকে ছুঁতে গেলেই তখন গায়ের রোঁয়া খাড়া ক'রে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে সামনের একটী পা চাটুর মত ক'রে তুলে এমন একটা ফোঁৎ ফোঁৎ শব্দ ক'রতে থাকে যে আমি ত হেসে লুটীয়ে পড়ি! বাচ্চাগুলোর চেহারা দেখেই ত একে হাসি পায়, তার ওপর একমুঠো প্রাণীর এই এতবড় কেরদানী দেখে আরও হাসতে ইচ্ছা করে। দাঁড়া আর দুদিন দেখি, তার পর ঝাঁটা মেরে বিদেয় ক'রব এসব আপদগুলোকে। ···তোর শেখানো মত খুকি এখন তার নাম ব'লতে শিখেছে, "আনান্ কলি।"

ভাবিজীও তোকে চিঠি দিলেন। দেখছি এই দু-দিন ধ'রে তিনি আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে চিঠিটা লিখছেন। আমি তাঁকে তোর চিঠিটা দেখতে দিইনি। কিনা এই হ'য়েছে তাঁর রাগ। কিছুতেই আমাকে তাঁর চিঠিটা দেখালেন না। না···ই দেখালেন, আমার ব'য়েই গেল। আমার সঙ্গে ভাবিজির আড়ি। দেখি এইবার কে সেধে ভাব ক'রতে আসে। আচ্ছা মাহ্‌বুবা, তুই আমায় ওর সব কথা লুকিয়ে জানিয়ে দিতে পারিস? তা হ'লে ওর সব গুমোর ফাঁক ক'রে দিই আমি।

মালকার কথা লিখেচিস। ওকে আবার চিনতে পারবো না। ক' বছরই বা আর সে আসেনি, এই বোধ হয় বছর পাচেক হ'ল, না? আচ্ছা, মেয়েদের ওপর একি জুলুম? পাঁচ পাঁচটা বছর ধরে বাপের বাড়ী আসতে দেবেনা, সামান্য একটা ঝগড়ার ছুতো নিয়ে।—যদি পারিস তবে মালকাকে বলে' এই মাগীকে দিয়ে আর একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিস। তাহলে খুব ভাল হয়, কেননা ঐ সঙ্গে ভাবিজীর চিঠিটাও পাব। ...আচ্ছা ভাই, এ মাগীর নাম এলোকেশী রাখল কে? এর যে আদতেই চুল নেই, তার আবার এলোকেশী হবে কি করে? যা দু চারিটী আছে ঝাঁটাগাছের মত এখন মাথায় গজিয়ে তাও আবার এলো করা নয়, মাথার ওপর একটি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র বাড়ীর মত করে বাঁধা। আমার এত হাসি পাচ্চে! এ যেন যার ঘরে একটা ম্যাচ বাক্সও নাই, তার নাম দেদার বক্স, দিনকাণা ছেলের নাম নজর আলি!

তার পর, তোর ভয় নেই লো ভয় নেই! তোর কুলের কথা কাউকে বলে দিইনি। তবে, আমার খুব রাগ হ'য়েছিল প্রথমে, আর এত লজ্জাও হ'চ্চে তোর এই সব ছিষ্টিছাড়া কথা শুনে।—ছি মা! তোমার গলায় দড়ীও

জোটেনা ? এক বুক জলে ডুবে ম'রতে পার না। ধিঙ্গি বেহায়া ছুঁড়ী ? আমি কাছে থাকলে তোর মুখ ঠেসে ধ'রতাম। খুবড়ো মেয়ের আবার মা হবার সাধ ! তাতে আবার যে সে মেয়ের নয়, ভাই-এর মেয়ের মা ! আ— তোর গালে কালি ! আয় তুই একবার পোড়ারমুখী হতভাগী, তার মজাটা ভাল করেই টের পাবি আমার কাছে !

পুরুষদের বিরুদ্ধে তোর যে মত, তাতে আমারও মতদ্বৈধ নেই। আমিও তোর বক্তিমেয় সায় দিচ্ছি। উকিল-'মুখ' তৈয়ার এর মত তুই যে সব যুক্তি-তর্ক এনেছিস তাতে আমার হাসিও পায় দু:খও হয়, আবার রাগও হয়। কারণ, আমি নির্ভয়ে বলতে পারি, তোর এই মর্দ্দানা হাম্বিতাম্বিতে কোন পুরুষপুঙ্গবের কিছুমাত্র আসে যায় না,—এরকম কলিকালের মেয়েদের তারা থোড়াই কেয়ার করে। এর বিহিত ব্যবস্থা করতেও পারেন তাঁরা, তবে কিনা তাঁরা পৌরুষ সম্পন্ন পুরুষ, তাই ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে চান না। যার গোঁফ আছে, তিনি তাতে চাড়া দিয়ে বলবেন, কত কত গেল রতি, ইনি এলেন আবার চকর্‌বর্তী ! আর, আমিও বলি, দু-দিন পরে যে পুরুষ-সোপর্দ্দ হবি তা বুঝি মনে নেই ! পড়িস, খোদা করে, আচ্ছা এক কড়া হাকিমের হাতে, তা হ'লে দেখবো লো তাঁর এজলাসে তুই কত নখনাড়া আর বক্তিমে দিতে পারিস। তখন উল্টো এই অনধিকার চর্চ্চার জন্যে তোর যা কিছু আছে, তার সব না বাজেয়াপ্ত হ'য়ে যায়, দেখিস।..... তোর মোকদ্দমা যে হঠাৎ একতরফা ডিগ্রী হ'য়ে গেল অর্থাৎ কিনা বিয়েটা মুলতুবি র'য়ে গেল, তজ্জন্য আমি আন্তরিক দু:খিত। ওঃ, তোর তরফের উকিল ভাবিজী সাহেবা কি তজ্জন্য কম লজ্জিত আর মর্ম্মাহত ? তাই তিনি এখন তাঁর জবর জবর কেতাব ঘেঁটে মস্ত আইন সংগ্রহ ক'রে, অকাট্য যুক্তি-তর্ক প্রয়োগে পুনরায় আপীল রুজু ক'রেছেন (তোর বরের নামে।) আসামীর নামে জোর তলব ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। তবে এখন দিন বাড়বে কিছুদিন, এই যা। তা হোক, মায় খরচা তুই ডিগ্রী পাবি, এ আমার যথেষ্ট ভরসা আছে। তুই ইত্যবসরে একটা ক্ষতি খেসারতের লিষ্টি ক'রে রাখিস্, আমি না হয় পেশকার হ'য়ে সেটা পেশ ক'রে দেবো হুজুরে। তাই ব'লে ঘুস নেওয়া ছাড়ছিনে। কিছু উপুড়-হাত না ক'রলে, বুঝেছিস ত, একেবারে মুলতুবী !' ভালই হ'ল, এ মোকদ্দমাটা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গড়িয়ে একটা বৈচিত্র্য, একটা রগড়ও দেখা গেল।—তুই হয় ত অবাক হচ্ছিস, আমি এত কথা শিখলাম কি ক'রে। কি করি, না শিখলে যে নয়,—নারে কা'ল সন্ধ্যে বেলায় ভাইজীতে আর ভাবিজীতে এই কথাগুলো হচ্ছিল, আমি আড়াল থেকে শুনে সেগুলো খুব মনে ক'রে রেখেছিলাম। এখন

তোর চিঠিতে সেই কথাগুলোই মজাদেখতে লাগিয়ে দিলাম। কি মজা !... সে যাক, তুই এখন তৈরী হ'য়ে থাকিস। বুঝেছিস আমার এই "বীণা পঞ্চমে বোল" ?—দাঁড়া ত আসুক সে মজার দিন, তবে না তোর এ ঘর ছেড়ে চ'লে যাওয়ার গুড়ে বালি প'ড়বে ? দেখবো তখন, খালাজীও তোকে কি ক'রে ধ'রে রাখেন। তখন হবি আমাদের ঘরের বউ, বুঝেছিস ? আমার ঐ বদরাগী খালাজীটিকে একেবার খুব দু'কথা শুনিয়ে দেব তখন। হাঁা, আমি ছাড়বার পাত্তর নই যতই কেন মুখরা বলুন তিনি। তার পর, তোর গুপ্ত খবর—যা শেষ ছত্রে পুনশ্চ লিখেছিস, তার অনেকটা বোধ হয় আমার লেখায় জানতে পেরেছিস। নরু ভাইজান নাকি বসরা যাবেন শীগগির, লিখেছেন। বাঙ্গালী পল্টন নাকি এইবার যুদ্ধে নামবে। তিনি লিখেছেন, কোন ভয় নেই, তবু আমাদের প্রাণ মানবে কেন বোন ? মা ত কেঁদে সারা। ভাইজান মন-মরা হ'য়ে প'ড়েছেন। ভাবিজীত শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছেন এ ক'দিন ধ'রে। আমার মনও কেমন এক রকম করে এক আধ সময়। তবু আমি ব'লতে চাই কি, আমার কিন্তু ওতে এতটুকু ভয় হয় না। পুরুষের ত কাজই ঐ। আজ-কালকার পুরুষরা যা হ'য়েছেন, তাতে ওঁদের জাতের ওপর ঘেন্না ধরিয়ে দিলে। ওদের হুবহু মেয়ে হবার সাধ,—সাজ-সজ্জা ধরণ-ধারণ সবতেই। কাজেই শরীরটা হ'চ্চে আমাদেরই মত ননীর ঢেলা, যাকে শুধু বিলাস-ব্যসনেই লাগানো যেতে পারে, কোন শক্ত কাজে নয় ; আর বাক্যবাগীশ এত হ'য়ে পড়েছেন যে, মেয়ের জাত মুখ গুটোতে বাধ্য হ'য়েছে। ছি বোন, এই কি পুরুষের কাজ ? যে পুরুষের পৌরুষ নেই, তারা সত্যিসত্যিই গোঁফ কামিয়ে ফেলতেদেখে আর দুঃখ হয় না। আমাদের বাড়ীর দারোয়ানটাকে গোঁফ কামানোর কথা ব'ললে সে রাগে একেবারে দশ হাত লাফিয়ে ওঠে, কেননা ওদের আর কিছু নাই থাক, গায়ে পুরুষের শক্তি আছে ; উল্টো আমাদের দেশে গোঁফ রাখতে ব'ললেই অনেকে ঐ রকম লাফিয়ে উঠবেন, কেননা তাঁদের গায়ে মেয়েদের ঝাল আছে। এঁরাই আবার বাড়ীর চৌহদ্দীর ভিতরে মেয়েদের অন্দরমহলে সেঁধিয়ে যাত্রার দলের ভীমের চেয়েও জোরে লাফ-ঝাঁফ জুড়ে দেন ! একেই বলে, নির্গুণো সাপের কুলোপানা ফণা"। আমার কেন মনে হ'চ্ছে নুরু ভাইজি আবার বেঁচে ফিরে আসবেন আর তুই হ'বি তার —আমার এই পুরুষ ভাই-এর—অঙ্কলক্ষ্মী। তুই হ'বি এক মহাপ্রাণ বিরাট-পুরুষের সহধর্মিণী। আমার মনে এ জোর যে কে দিচ্চে তা বলতে রি নে, তবে কথা কি, আমার মন তোদের মত শুধু অলক্ষুনে কথাই ভাবে না।... ...এইখানে কিন্তু তোর সঙ্গে একটা মস্ত ঝগড়া আছে।

বলি, হ্যাঁলো মুখপুড়ী বাঁদরী। তোর আর বুদ্ধি হবে কখন? সে-কি কবরে গিয়ে? দু-দিন বাদে যে নূরু ভাইজির সাথে তোর বিয়ে হবে কোন লজ্জায় তুই তাঁর নাম নিস আবার ভাইজি বলে' লিখিস? ওরে আমার ভাই-এর দরদী বোনরে? দূর আবাগী হতচ্ছাড়ী, তুই একদম বেহায়া বেল্লিক হ'য়ে পড়েচিস।

আচ্ছা ভাই 'কলমী-লতা'। তুই আমার নুরু ভাইজানকে খুব জান থেকে ভালোবাসিস, না? সত্যি করে' লিখিস ভাই,—নৈলে আমার মাথা খাস। যদি ঝুট ব'লিস তা হ'লে তোর সাথে (এই আঙ্গুল ফুটিয়ে ব'লচি) আড়ি—আড়ি—আড়ি। তিন সত্যি ক'রলাম একেবারে। আর, বাস্তবিক সই, আমার এ ভাইটির কাউকে শত্রু হ'তে দেখলাম না। কেই বা ওঁকে ভালোবাসে না?—যাকে খোদায় মারে, তাকে বুঝি সবাই এমনই একটা স্নেহের, বেদনাভরা দৃষ্টি দিয়ে দেখে। মনে হয়, আহা রে হতভাগা, কি করে' তুই এত দুঃখ হাসিমুখে বইছিস? অথচ সব চেয়ে মজা এই যে, যার জন্যে আমরা এত বেদনা, ব্যথা অনুভব করি; সে ভুলেও সে কথার উল্লেখ করে না, নিজের ভাবে নিজেই মশগুল। উলেট তার দুঃখে কেউ এই সহানুভূতির কথা জানাতে গেলে তার সঙ্গে সে মারামারি করে' বসে। এ মানুষ বড় সাবধান, যেই বুঝতে পারে যে, অন্যে তার বেদনা বুঝতে পেরেছে অম্‌নি সে ছটফটিয়ে ওঠে; তার ওপর তার ঐ অতবড় দুর্ব্বলতা ধরে' আহাম্মকের মত তাতে হাত দিতে গেলে ত আর কথাই নাই, সে একেবারে ক্ষিপ্ত সিংহের মত তার ওপর লাফিয়ে পড়ে।—আমার ত এই রকমই মনে হয়। নুরু ভাইজিকে যেন আমি অনেকটা এই রকমই বুঝি, অবশ্য এক আধটু গরমিলও দেখা যায়। তুই কি ব'লিস?

থাকগে, এসব বাজে কথা। শীগগীর উত্তর দিস। ইতি

তোর "সজনে ফুল"—

সোফিয়া

করাচি সেনা নিবাস

১৫ই ফেব্রুয়ারী (দুপুর)

ভাবী সাহেবা।

হাজার হাজার আদাব। আপনার চিঠি পেয়েচি। সব কথা বুঝে' উত্তর দেবার মত মনের অবস্থা নেই আর সময়ও নেই। পরে যদি সময় পাই আর ইচ্ছা হয়, তবে আপনার সব অনুযোগের একটা মোটামুটি কৈফিয়ৎ ভেবে-চিন্তে

দিলেও দিতে পারি। কিন্তু ব'লে রাখছি আমি,—আর আপনারা আমায় এ রকম ক'রে আঘাত ক'রবেন না। মানুষ মাত্রেরই দুর্ব্বলতা থাকে, কিন্তু সেটাকে প্রকাশ করাও যে একটা মস্ত বড় দুর্ব্বলতা, তা' আজ আমি হাড়ে হাড়ে বুঝচি। তা না হ'লে আজ আমি এত কষ্ট পেতাম না। আপনাদের এ আঘাত দেবার অধিকার আছে বটে, আমারও সইবার অধিকার আছে, কিন্তু সইবার শক্তি নেই আমার। এটা ত বোঝা উচিত ছিল। আমার এই কথা কটি বুঝতে চেষ্টা ক'রে আমার এই নির্দ্দয় কঠোরতাকে ক্ষমা কর'বেন।

দেখুন, মানুষের যেখানে ব্যথা, সেইখানটা টিপেও সে আরাম পায় না। অন্তরের বেদনাও ঠিক ঐ রকমের। তাই, জেনে হোক—না জেনে হোক, কেউ সেই বেদনায় ছোঁওয়া দিলে এমন একটা মাদকতা-ভরা আরাম পাওয়া যায়, যেটার পাওয়া হ'তে হাজার চেষ্টাতেও নিজেকে বঞ্চিত করা যায় না, বা এড়িয়ে চ'লবারও শক্তি অসাড় হ'য়ে যায়, এমনই ভয়ানক এর প্রলোভন। তাই আমি মুক্তকণ্ঠে ব'লছি, আপ-নাদের দেওয়া এই আমার বেদনার আঘাত মধুর হ'লেও আমার কাছে অকরুণ-ভীষণ—দুর্ব্বিসহ। এ আমাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। এ প্রলোভনের মুখে একটু ঢিলে হ'য়ে পড়লে পদ্মার ঢেউএ খড়-কুটোটির মত ভেসে যাবে।—সে কি ভয়ানক! আমার অন্তর শিউরে উঠছে। পায়ে পড়ি আপনাদের, আর আমায় এমন ক'রে ক্ষেপিয়ে তুলবেন না। আমার বেদনা ভরা দুর্ব্বলতার মূল কোথায় জেনে ঠিক সেইখানে কসাই-এর মত ছুরি বসাবেন না। রক্ষা করুণ—মুক্তি দেন আপনাদের এই স্নেহেরঅধিকার হ'তে। আমার প্রকাশ-করা দুর্ব্বলতা আমারই ক্ষুব্ধ বুকে পল্টনের-জল্লাদের হাতের কাঁটার চাবুকের আঘাতের মত বাজছে। তাই এ চিঠিটা লিখছি আর রাগে আমার অষ্টাঙ্গ থর থর ক'রে কাঁপছে। আমার মতন বোকচন্দ্র বোধ হয় আর দুনিয়ায় দুটি নেই।

আমাদের "মোবিলিজেশন অর্ডার" বা যুদ্ধ-সজ্জার হুকুম হ'য়েছে। তাই চারিদিকে "সাজ সাজ" রব পড়ে' গেছে। খুব-শীঘ্রই আরব-সাগর পেরিয়ে মেসোপটেমিয়ার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে গিয়ে, তাই আমার আনন্দ আর আমাতে ধরছেনা। আমি চাচ্ছিলাম আগুন—শুধু আগুন—সারা বিশ্বের আকাশে বাতাসে, বাইরে ভিতরে আগুন, আর তার মাঝে আমি দাঁড়াই আমারও বিশ্বগ্রাসী অন্তরের আগুন নিয়ে আর দেখি কোন আগুন কোন আগুনকে গ্রাস ক'রে নিতে পারে, আরো চাচ্ছিলাম মানুষের খুন। ইচ্ছা হয়, সারা দুনিয়ার মানুষগুলোর ঘাড় মুচড়ে' চোঁ চোঁ ক'রে তাদেরসমস্ত রক্ত শুষে নিই, তবে আমার কতক তৃষ্ণা মেটে। কেন মানুষের ওপর আমার এত শত্রুতা? কি দুষমনী

করেছে তারা আমার ? তা' আমি বলতে পারব না। তবে, তারা আমার দুষমন নয়, তবুও আমার তাদের রক্তপানে আকুল আকাঙ্ক্ষা। সব চেয়ে মজার কথা হ'চ্ছে এখানে যে, এই মানুষেরই এতটুকু দুঃখ দেখে সময় সময় আমার সারা বুক শাহারার মত হা—হা করে' আর্ত্তনাদ করে' ওঠে। হৃদয়ের এই যে দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত দুষমনীভাব, এর সূত্র কোথায়'—হায়, কেউ জানে না। অনেক অনধিকারী আমার এ জ্বালা, এ বেদনা বুঝবে না ভাবী সাহেবা, বুঝবে না। বড্ডো ব্যস্ত, খালি ছুটোছুটি,—তারই মধ্যে তাড়াতাড়ি যা পারলাম, লিখে দিলাম। চিঠিটা দু-তিনবার পড়ে' আমার বক্তব্য বুঝবার চেষ্টা ক'রবেন।

তারপর আপনি মাহবুবার কথা লিখেছেন। সে অনেক কথা। এর সব কথা খুলে' ব'লবার এখনও সময় আসেনি। তবে এখনও এইটুকু বলে, রাখছি আপনাকে যে, মানুষকে আঘাত করে' হত্যা ক'রেই আমার আনন্দ! **আমার এ নিষ্ঠুর পাশবিক দুষমনী মানুষের ওপর নয়, মানুষের স্রষ্টার ওপর!** এই স্থষ্টিকর্ত্তা যিনিই হন, তাঁকে আমি কখনই ক্ষমা ক'রতে পারবো না—পারবো না,—পারবো না। আমাকে লক্ষ জীবন জাহান্নমে পুড়িয়েও আমায় কব্জায় আনবার শক্তি ঐ অনন্ত অসীম শক্তিধারীর নেই। তাঁর সূর্য্য, তাঁর বিশ্ব গ্রাস ক'রবার মত ক্ষুদ্র শক্তি আমারও অন্তরে আছে। আমি তাঁকে তবে ভয় ক'রব কেন?...আপনি আমায় শয়তান বল'বেন আমার এ ঔদ্ধত্য দেখে কানে আঙ্গুল দিবেন জানি,—ওহ্, তাই হোক। বিশ্বের সব কিছু মিলে আমায় ''শয়তান পিশাচ'' বলে' অভিহিত করুক, তবে, না আমার খেদ মেটে, একটু সত্যিকার আনন্দ পাই। আঃ!...যে মানুষের স্রষ্টাকে ভয় করেনি আমি, সেই মানুষকে ভয় করে' আমার অন্তরের সত্যকে গোপন ক'রব কেন? আমি কি এতই ছোট, এতই নীচ? আমার অন্তর মিথ্যা হ'তে দেবো না। হঁা, কি ব'লেছিলাম? আমি বিশ্বাসঘাতক—জল্লাদ। বাঁশীর সুরে হরিণীকে ডেকে এনে তার বুকে বিষমাখা তলওয়ার চালিয়ে আর ''জহর-আলুদা'' তীর হেনেই আমার সুখ। সে কি আনন্দ ভাবী সাহেবা সে কি আনন্দ এই হত্যায়। আমার হাত-পা-বুক বজ্রের মত শক্ত হ'য়ে উঠছে।

কি আমায় মাতাল করে' তুলছে আর সঙ্গে সঙ্গে সে কোন অনন্ত যুগের অফুরন্ত কান্না কণ্ঠ পর্য্যন্ত ফেনিয়ে উঠছে বিষের মত—তীব্র হলাহলের মত! —আর লেখার শক্তি নেই এখন আমার!—ইতি।

নর-পিশাচ—
নুরুল হুদা

(৬)

বাঁকুড়া
২রা ফেব্রুয়ারী,
(নিশুত রাত্তির)

কবি-সৈনিক নূরু !

"একচোখো" "এক-রোখা" প্রভৃতি তোর-দেওয়া ঝুড়ি ঝুড়ি বিশেষণ আমি আমার আঁতুড় ঘর থেকে এই বিশ বছুরের "যৌবন বয়স" নাগাদ বরাবর কুইনাইনি-মিক্সাচারের মতন গলাধঃকরণ ক'রতে প্রাণপণে আপত্তি জানিয়েছি, কারণ সে সময় এ সব অপবাদে জোর 'চটিতং' হ'য়ে মনে ক'রতাম তোর স্বভাবই হ'চ্চে লোকের সঙ্গে কর্কশ বেয়াদপী করা আর মুখের ওপর নির্ম্মম প্রত্যুত্তর করা। অনেক সময় তোর ঐ নির্ভীক সত্য ও স্পষ্ট-বাদিতা এবং ন্যায় ও আত্মসম্মানের গভীর অনুভূতিকে অহঙ্কার অহমিকা প্রভৃতি ব'লেও মনে ক'রেছি। বন্ধু মহলেও তোর ঐ কথা নিয়ে অনেক সময় কুৎসা হ'য়েছে। কিন্তু আজ শোবার আগে হঠাৎ তোর কথা মনে প'ড়ে গেল পাশের এক বালিকাকণ্ঠে এই গানটা শুনে,—

"মনে র'য়ে গেল মনের কথা,
শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা।"

আরো মনে প'ড়লো এই গানটাই তোর মুখে হাজারবার শুনেছি এবং আজো কচি গলার সুরে তা শুনলাম, কিন্তু সে সময় তোর কণ্ঠে যে গভীর বেদনার আভাস ফুটে' উটতো, জনম-জনম অতৃপ্ত থাকার ব্যথা-কান্না যে শিহরণ-ভরা মূর্চ্ছনার সৃজন ক'রতো, তা' এ বালিকার সরল কণ্ঠের সহজ সুরে পাই না। এই কথাটি মনে হ'তেই তোর সজল কাজল-আঁখির-আকুল-কামনা-ভরা চিঠিটা আর একবার প'ড়তে বড্ডো ইচ্ছে হ'ল। আজ এই নিশীথ রাতে তোর মেঘলা দিনের লেখা চিঠিটা প'ড়তে প'ড়তে ভাবছিলাম, চিঠিটা প্রথম দিন পেয়ে কেন এমন অভিভূত হইনি ঃ সেদিন বুঝি চারিদিককার কোলাহলে তোর প্রাণের গভীর কথা আমায় শুনিয়ে বুঝতে দেয়নি, শুধু ওতে যে মুক্ত হাসির স্বচ্ছ ধারাটুকু আছে, সেই ধারার কলোচ্ছ্বাসই আমার মন ভুলিয়েছিল। আজ যেন কোন গুণীর পরশে সহসা আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে' গিয়েছে আর তোর মর্ম্মের

মর্ম্মস্থলেরও নিষ্করুণ চিত্র দেখতে পেয়েছি। তাই আজ বুঝেছি ভাই, এ কি অকরুণ নীরেট হাসি তোর! কান্না সওয়া যায়, কিন্তু বেদনাতুরের মুখে এই যে কুলিশ-কঠোর হিম হাসি, এ যে জমাট শক্ত অশ্রু-তুহিন; এ যে পাথরও সইতে পারে না। যার প্রাণ আছে, বেদনার অনুভূতি আছে, যে এমনি নীরব রাতে একা বসে' কোন স্নেহ-হারার এমনি নীরস শুষ্ক হাসি শুনেছে, সেই বোঝে এ হাসি কত দুর্বিবসহ! তাই আজ তোর চিঠিটা প'ড়তে প'ড়তে বুকের ভেতর অনেক দূর পর্যন্ত তোলপাড় ক'রে উঠতে লাগলো!

একটি ছোট্ট প্রদীপ জ্বালিয়ে এই আঁধার বিভাবরীতে আমার সামনের বাতায়ন দিয়ে যতদূর দেখা যায় দেখতে চেষ্টা ক'রছি আর ভাবছি,—হায় তোর জীবনের রহস্যটা এই অন্ধকার-নিপীড়িত নিশীথের চেয়েও নিবিড় কৃষ্ণপর্দায় আবৃত; সে বধির-যবনিকা চিরে তোর অন্তরের অনন্ত দিঙমণ্ডলের সন্ধান নিতে যাচ্ছি আমার এই ঘরের প্রদীপটির মতই ক্ষীণ আলোক শিখা নিয়ে। তাই বুঝি অন্তরঙ্গ সখা হ'য়েও তোর ঐ-থই মনের থই পেলাম না, অসীম হিয়ার সীমা-রেখা ধরি-ধরি ক'রেও ধ'রতে পারলাম না। ও-মন কেবলই আমাকে আকাশের মত প্রতারিত ক'রেছে; যখনই মনে করেছি—ঐ ঐখানে ঐ গাঙের পারে যেখানে আকুল আকাশ আর উদাস মাঠে চুমো-চুমি হ'য়েচে, তখনই আমি প্রতারিত হ'য়েছি। সেই মিলন-সীমায় পদাঙ্ক আঁকতে যতই ছুটে গিয়েছি' ততই সে দিকের শেষ দূরে—আরো দূরে সরে' গিয়েছে। কোথায় এ বাঁধন হারা দিগ্বলয় আর অসীম আকাশের মোহানা, তা কে জানে? আমরা নিয়তই বাঁধন-বাঁধার ডোর সৃজন ক'রে ঐ অসীমতাকে ধ'রবার চেষ্টা ক'রছি, আর দুষ্টু চপল শশক-শিশুর মত সে ততই এক অজানা বনের গহন-পথের পানে ছুটে চ'লছে! সে দুরন্ত-শিশু নেমে আসে কখনো মাঠের ধারে গাঁয়ের পাশে, কখনো গাঙ পারিয়ে আমলকী-ছায়া-শীতল ঝর্ণা-তীরে, আবার কখনো শাল পিয়াল আর পলাশবনের আলো-ছায়ায়। একটি পাতাঝরার শব্দ শুনেই সে চমকে' উঠে' অনেক দূরে গিয়ে তার চঞ্চল চোখের নীল চাউনীর ইশারায় ভ্রান্ত পথিককে ডাকতে থাকে। তোর নিরুদ্দিষ্ট উদাসীন মন অমনি সে-কোন এক আবছায়া-ভরা অচিন অসীমের পানে যে ছুটেছে, তা তুইই জানিস; তোর এই কাণ্ডারীহীন হিয়ার তরী যে কোন অকূলের কূল লক্ষ্য করে' এমন খাপছাড়া পথে পাড়ি দিয়েছে, তা কোন মাঝিই জানে না। আমি ভাবছি, হয় ত এ নিরুদ্দেশ যাত্রীর দুঃসাহসী ডিঙাখানি ঐ দুই অসীমের মোহনাতেই গিয়ে জয়ধ্বনি ক'রবে না হয়, কোথাও ঘূর্ণী-আবর্ত্তে পড়ে' হঠাৎ ডুবে যাবে, নয় ত কোন চোরা-পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ডিঙার বাঁধন ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে যাবে। ভবিষ্যতটা আমি

নির্দ্দয়ভাবেই কল্পনা ক'রলাম, কারণ আমি জানি নির্ম্মম সত্য তোর কাছে কোন দিনই অপ্রিয় লাগেনি এবারেও আমার এ-সব বেহুদা কথায় রাগবি নে বা দুঃখ পাবি নে আশা করি।

তোর সজল, কাজল-আঁখি প্রেয়সী যে কোন কোকাফ মুল্লুকের পরীজাদী, তাই ভেবে আমি আকুল হ'চ্ছি শ্রীমতী মাহবুবা খাতুনই সে সৌভাগ্যবতী কিনা, সে সম্বন্ধে এখনো আমি সন্দেহ দোলায় দুলছি। তা হ'লে তুই আগে মত দিয়ে পরে বিয়ের ক'দিন আগে তাকে কেন এমন ক'রে এড়িয়ে ত্যাগ ক'রে গেলি ? তোর এ এড়িয়ে-যাওয়ার দু'রকম মানে হ'তে পারে ; প্রথম, হয় ত তাকে ভালো বাসিসনি,—দ্বিতীয়, হয় ত তাকে মন দিয়ে ফেলেছিলি ব'লেই নিজের এই দুর্ব্বলতা ধরা পড়ার ভয়ে এমন ক'রে ভেসে গেলি। কোনটা সত্য ? আমার বোধহয়, দ্বিতীয় ঘটনাটাই ঘটা খুব সম্ভব আর স্বাভাবিক। তুই আমার এই সব মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ দেখে আমায় ঔপন্যাসিক ঠাউরাসনে যেন। সকলের পক্ষে যেটার অন্তরে উদয় হওয়া স্বাভাবিক, আমি কেবল সেইটাই যতটা প্রকাশ করা যায়, ভাষার বাঁধন দিয়ে আগলাবার চেষ্টা করছি। মাহবুবার অবস্থা আমি নিজে কিছু না দেখলেও বুবুজান যে রকম ক'রে ব'লছিলেন, তাতে মর্ম্মর দেউলেরও বুক ফেটে যাবার কথা। অবশ্য তিনি সব কথা খুলে' ব'লতে পারছিলেন না আমার কাছে ; কিন্তু ঐ বাধো-বাধো-ভাবে কথাটা চাপতে গিয়েই সেটার গোপন তত্ত্ব যতটা প্রকাশ হ য়ে প'ড়ছিল, তাতে আমি হলফ ক'রে ব'লতে পারি যে, সে বেচারীর নরম বুকে তোর ভালোবাসার "খেদং তীর" বড় গভীর হ'য়ে বিঁধেছে ! এ নিদারুণ শায়কেরর বিষ তার রক্তে রক্তে ছড়িয়ে প'ড়েছে ! বুঝি সে অভাগীর আর রক্ষে নেই। বুবুজানও এই ভেবে এক রকম অস্থির হ'য়েই প'ড়েছেন। তাঁর ভয়ের আসল কারণ বোধ হয়, তিনি মনে করেন যে, মৌন বুকের এই বধির চাপা ভালোবাসার গভীরতা যেমন বেশী, মারাত্মকও তেমনি। এই গভীর বেদনাই তাকে হত্যা ক'রে ছাড়বে।...তাই সব নানান দিক দেখে' আমার আর ইচ্ছে হয় না ভাই যে বিয়ে করি। আমার অন্তরঙ্গ সখার বুভুক্ষু আঁখির আগে আমি নিজের ভালোবাসার ক্ষুধা মেটাবো, আর সে শুধু গোবী-সাহারার তপ্ত বালুকায় দাঁড়িয়ে জাতি-ফাটা পিয়াস নিয়ে তেষ্টায় বুক ফেটে ম'রবে, এমন স্বার্থপরের মত ছোট কথা ভাবতেও যে আমার জানটা ওলট-পালট ক'রে ওঠে ভাই ! তাই আমি আজ গোলাবী শরবতের পেয়ালা ওষ্ঠের কাছে ধ'রে ভাবছি,—পিয়াষা মিটাই, না ঐ পেয়ালা চূর্ণ ক'রে তোর মত অজানার পথে বেরিয়ে পড়ি। তুই এ পথ-হারা অন্ধকে পথ দেখিয়ে দিতে পারিস ? ভেসে পড়ি তা হ'লে আল্লা ব'লে। কিন্তু ব'লে রাখি, জটিল

জটা-জুটধারী লোটা-কম্বল-সম্বল "কমলী ওয়ালে" সাজতে আমি পারবো না। নাগা সন্ন্যাসীর মত স্বার্থের বৈরাগ্য আমার মুক্তি পথ নয়। আমার মত গো-মুক্ষুর কথা যদি শুনিস, তা হ'লে আমি বলি কি, তোর গুরুদেবের উদাত্ত নির্ভীক বাণীতে তুইও যোগ দিয়ে প্রদীপ্ত কণ্ঠে বুক ফুলিয়ে বল ;—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ !"

আছে তোর এ সাহস ? বল্ তা হ'লে আমিও বিসমিল্লাহ ব'লে কাছা এঁটে একবার লেগে পড়ি।

হ্যাঁ, তার পর—ঝড়-বিষ্টির মাতামাতিতে তোর কোন জাঁদরেলতন্বীর বা জাঁহাবাজ-কিশোরীর দাপা দাপি মনে প'ড়েছিল রে ? আমি ত ভেবেই পাচ্ছিনে। শুনি, কবিকুল নাকি কল্পলোকের জীব ; তারা স্রেফ্ কল্পনা নিয়েই মশগুল, তাঁদের কথার বাস্তবতা একরকম 'নদারদ' ব'ললেই হয়। আর, এই যদি হয় কবির সংজ্ঞা, তা-হ'লে তুইও কবি (এবং সেই জন্যেই তোকে প্রথমেই কবি-সৈনিক ব'লে সম্বোধন ক'রেছি)। আচ্ছা, এই যে, তোর খেলার সাথী দুষ্ট চপল প্রিয়া, ইনি তোর মানসী-বধু, না কোন রক্ত-মাংসের শরীর-ধারিণী সত্যিকার মানবী ? রাজকন্যা স্বপ্নরাণী, পরীস্থানের বাদশাজাদী, ঘুমের দেশের আলোক-কুমারী বা ঐ কেসেমেরই যত সব উদ্ভট সুন্দরীদের রাঙা চরণের আশা যদি থাকে তোর, তবে দ্বিতীয় ভাগের সুবোধ বালকের মতন ও-সব খাম-খেয়ালী এক্ষুণি ছেড়ে দে, ছেড়ে দে ! গোলেবকাওলিতেই লেখা থাক, বা আরব্য উপন্যাসের উজিরজাদীই বলুন,—কিন্তু কই কাউকে ত সত্যি সত্যিই কোন পাখনা-ওয়ালী পরী এসে উড়িয়ে নিয়ে গেছে ব'লে শুনলাম না। পালঙ্ক শুদ্ধ উড়িয়ে না নিয়ে থাকলে ভাই, অন্ততঃ বিছানায় চাদরটা জড়িয়েও, আমাকে ঐ পরী বানুরা এক-আধ দিন তাঁদের আজব দেশে নিয়ে যেতে পারতেন। কত দিনে শরৎ, হেমন্ত, গ্রীষ্ম, বসন্তের চাঁদিনী-চর্চ্চিত যামিনীতে ছাদে শুয়ে শুয়ে সর্দ্দি-কাশি ধরিয়েছি, কিন্তু এ পোড়াকপালে ঐ গগনমার্গের দিকে চক্ষু তেড়ে তাকানো ছাড়া আর ওড়া হ'ল না। বাদুড় চাম্‌চিকে উড়ে যেতে অনেক দেখেছি, কিন্তু কোন পরীর আস্‌মানী চাদর বা হেনায়-রাঙা পদ-পল্লব বা ডাঁশা আঙুরের মতন চল্‌চলে মুখ দেখা ত দূরের কথা, তাদের পাখা-পাখনার একটি পালকেরও কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।—সে সব যাক্, এখন তোর নামে মস্ত একটা অভিযোগ দেবো, যে অভিযোগ কখনও দেবো ব'লে আমার

আজকের রাতের আগে আর মনে হয়নি! আজ যেন দিনের মতন সাফ্ বুঝতে পাচ্ছি, কখনো তোর মনের কথা পাইনি বা তোকে বুঝ্তে পারিনি। শুধু তোর ঐ 'ওপরকার হাসির ছটাতেই ভুলে ছিলাম। আজ যখন তুই অনেক দূরে মরণের বুকে দাঁড়িয়ে তাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ ক'রছিস, যখন মনে প'ড়ছে যে হয় ত তোর সাথে আমাদের আর দেখা নাও হ'তে পারে, তখনই বুকের ভিতর এক অশান্ত অশোয়াস্তি তোল-পাড় ক'রে উঠছে—হায়, কেন এত দিন তোকে কাছে পেয়েও আরো কাছে পাইনি; কেন তোকে বুঝতে পারিনি।—কার করুণা-মাখা অধর, কার বিদায়-খনের-চেয়ে থাকা তোকে মেঘলা-দিনে এমন উতলা ক'রে তোলে? সজল-মেঘ কার কাজল-নয়ন মনে করিয়ে দেয়? আমি তাই এ নিশীথ রাতে একলা ব'সে ভাবছি আর ভাবছি। সে কে? কোন্ কিশোরীর ভালোবাসার হীরা তোর মনের কাচকে দু-ফাঁক ক'রে কেটে দিয়েছে? কোন খাতুনের মুখ-সরোজ তোর হিয়ার সরসীতে এমন চিরন্তনী হ'য়ে ফুটেছে? তা তুই আর হয় ত তোর মানসী দেবী ছাড়া কেউ জানে না। তোর জীবনের পথে আচম্‌কা-আসা অনেকগুলি কাচা-কিশোর মুখ মনের মাঝে ভেসে উঠছে, কিন্তু কোনটাকেই মনে লাগছেনা যে এ-তোর মর্ম্মর মর্ম্মে স্থায়ী নিবিড় দাগ কাটতে পারে। এ সবারই মাধুরী শুধু সৌদামিণীর চমকে হেসে আঁধার পথের যাত্রীর চোখ ঝল্‌সিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। একটা কথা কিন্তু এইখানে মনে হ'চ্চে আমার।—যদি কোন এক কিশোরী কুমারীর মাঝে থাকতো আমার ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্তা শোফিয়া খাতুনের গভীর অভিমান ভরা মিষ্টি দুষ্টমী আর অবাধ্য চপলতা, এবং সেই সাথে শ্রীমতী মাহ্‌বুবা খাতুনের নিবিড় ভালোবাসা-মাখা করুণা ও বিদ্রোহ-মাধুর্য্যের আমেজ'—আর সেই সুন্দরী যদি নিঃসঙ্কোচে সহজ সরল ভাবে তোমাকে তোর পথে জোর ক'রে টেনে' নিয়ে যেতে পারতো, তবে একমাত্র সেই তোর বাঁধন-হারা জীবনটাকে এমন ক'রে সবার মাঝে শুকিয়ে ম'রতে না দিয়ে সফলতার পুষ্পমঞ্জরীতে, গুঞ্জরিত ক'রে তুলতো।—তুই বাইরে যত লড়ই বেহায়া বেল্লিকপনা করিস্‌না কেন, অন্তরে তোরি মতন লাজুক আর কেউ নেই; তোর ভিতরের লজ্জাশীলতার কাছে আমাদের নব-বধূদেরও হা'র মানতে হবে। আমি বরাবর দেখে এসেছি, যেখানে বেশ সোজা ভাবে মিশতে না পারার দরুণ তোর গোপন দুর্ব্বলতার শক্ত বাঁধন একটু শিথিল হ'য়ে এসেছে, সেইখানেই তুই মন্ত্র-বশীভূত গোখরো সাপের মতন ফনা গুটীয়ে ব'সে প'ড়েছিস। বিশেষতঃ, কোনো অচেনা সুন্দরী তরুণীর মুখোমুখি হ'হেই তুই দু-এক দিন যে রকম ব্যতিব্যস্ত খাপছাড়া ভাব দেখাতিস কথায় কাজে, তার সত্যিকার গূঢ় হেতুটা কি বল্ দেখি? সেটা সুষমা পিপাসু

মনের সৌন্দর্য্যতৃষা, না ঐ রূপের ফাঁদে ধরা প'ড়বার ভীতিকম্পন ? তোর আরো একটা দুর্বলতা ও শক্ত শক্তির কথা মনে প'ড়ছে আমার—তুই যেমন শীগ্‌গির কোন কিছুকে অভিভূত হ'য়ে পড়তিস, সেই রকম শীঘ্রই আবার সেটার কবল থেকে নিজেকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিতে পারতিস। অবশ্য শেষের গুণটা পৌরুষতা না হ'য়ে নির্ম্মমতারই বেশী পরিচয় দেয়। তোকে যে ধ'রতে যাবে, তাকে আগে নিজেকে ধরা দিতে হবে। অনবরত স্নেহের সুরধুনী বইয়ে প্রীতির মরুদ্যান রচনা ক'রে, তোর মরু-যাত্রী পিয়াসী আত্মাকে যদি কোন নারী প্রলুব্ধ আকৃষ্ট ক'রতে পারতো, তা হ'লে বোধ হয় এই তরুণ বয়সেই তোর বেদনার বোঝা এত অসহ্য হ'য়ে উঠতো না ! তোর মতন বিপুল অভিমানী যে কারুর স্নেহ যাচ্ঞা করে না, তা আমি জানি। আমি আরো জানি, তোদের মত অভিমানীদের আত্মসম্মান জ্ঞান আর দুর্বলতা ধরা প'ড়বার ভয়, ভয়ানক তীক্ষ্ণ সজাগ। কিন্তু এ আমি ব'লবোই যে, এটা তোদের অনেকটা যেন একগুয়েমী ; তোদের মনের অতৃপ্ত কামনা একটা তরুণ বুকের স্নেহ-ভালবাসা পাবার আশায়, দুটি টানা চোখের মদিরাভরা শিথিল চাহনীর আবেশের ক্ষুধায়, একটি কম্পিত পাৎলা ঠোঁটের উষ্ণ পরশের তৃষ্ণায় হা হা ক'রে ছাতি ফেটে ম'রছে—বোশেখ-মধ্যাহ্নের আতপ তপ্ত ভুখারী ভিক্ষুকের মত ! কিন্তু এত আকণ্ঠ পিপাসা নিয়েও সে তৃষাতুর কামনা শুধু তীব্র অভিমানের রোষে আত্মহত্যা ক'রছে ! নর-ঘাতকের মত তোরা বাসনা গর্দ্দানে খড়্গের উপর খড়্গ হেনে তাকে কাটতে ত পারছিসইনে, শুধু কচলিয়ে মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা দিচ্চিস ! তবু পাষাণ-তোদের বিক্ষুব্ধ ক্ষোভ মিটলোনা মিটলোনা ! এর ফল বড্ডো ভয়ানক, অতি নিষ্করুণ ! তাই বলি ভাই নূর, তোর পায়ে প'ড়ে বলি, ফিরিয়ে আন তোর এ গোঁয়ার মনকে এই গোবীর তপ্ত ঊষর ধূ-ধূ শুষ্কতা হ'তে ! এতে অন্ধ হবি, শক্তি হারাবি, অথচ কিছুই হবে না জীবনের। তোর মধ্যে যে বিরাট শক্তি সিংহ সুপ্ত র'য়েছে, কেন এমন ক'রে এক অজানায় ওপর অন্ধ অভিমানের ক্ষিপ্ততায় হত্যা ক'রবি ? সংসার থেকে সংসারের বাঁধনকেই উপেক্ষা ক'রে এ স্পর্দ্ধার অট্টহাসি হেসে প্রকৃতির ওপর প্রতিশোধ নেওয়া অসম্ভব রে অসম্ভব ! ফিরে আয় ভাই ফিরে আয় এ ধ্বংসের বন্ধুর পথ হ'তে !—তোর প্রাণের অগ্নি-বীণার এই যে আগুন-ভরা দীপক-রাগ আলাপ' এ যে তোকে পুড়িয়ে খাক ক'রে ছাড়বে ভাই ! মেঘ-মল্লারের স্নেহ-স্নিগ্ধস্পর্শ ছাড়া এ আগুন শান্ত ক'রবে কে ? যদি ধরা না দেওয়া, বাধন এড়ানোতেই তোর আনন্দ, তবে তোর এ জীবন-ভরা চঞ্চলতা দিয়ে পথের ভ্রান্ত পথিকগুলিকে মুগ্ধ তৃষ্ণিকায় ফেলে যাওয়াটাই কি খুব বড় পৌরুষের কথা ? এ কি পাণ্ডুর—পাংশু আনন্দ ! জানি, তুই

ব'লবি, "আমার এই পথ চালাতেই আনন্দ!" কিন্তু এতদিন ভুলেছি, আজ আর ও ফাঁকির কথায় ভুলছিনে। আজ তোর এই বাদলের কান্না-ভরা চিঠিটা প'ড়চি সেই সঙ্গে তোর অনেক দিনের অনেক কথা আমার মনের দীঘিতে বুদ্‌বুদ্ কাটছে, আর তারই সাথে মনে হ'চ্চে, তোর মনের মানুষের এত দিনের যেন অনেকটা নাগাল পেয়েছি। পল্লীমাঠের "ভুলুনে' ভূত"-এর মত আর এ চতুর মনকে পথ ভুলোতে পারছিসনে, ব'লে রাখলাম। এইবার যেন বুঝতে পারছি, তোর পাষাণ বুকের ভেতর জ'লছে লক্ষ আগ্নেয়গিরির অনন্ত বহ্নিশিখা ধু ধু ধু। তাকে আটকে রাখতে প্রয়াস পাচ্ছে তোর ঐ শক্ত অমানুষিক ধৈর্য্যের আবরণ। তোর হৃদয়-ভরা বেদনার রক্ত-ঢেউ পাঁজরের বাঁধ ভেঙে কণ্ঠের সীমা ছাপিয়ে উঠছে দিনের পর দিন উত্তালবিদ্রোহ-তরঙ্গের সৃষ্টি ক'রছে। তারই রুদ্র-কান্না হাসি হ'য়ে তোর রুক্ষ্ম অধর-ওষ্ঠে আছাড় খাচ্ছে, হাঃ হাঃ হাঃ। শুধু হাসি—কাঠচোটা হাসি! আর প্রতারণা ক'রতে পারবিনে রে আমায়, আর তুই মিথ্যা দিয়ে আমার বারে বারে ঠকাতে পারবিনে; আজ আমার আপন বেদনা দিয়ে তোর হাসি-কান্নার সত্য উৎস আবিষ্কার করেছি। তোর ব্যথার এ অফুরন্ত উৎস চেনা-পথিকদের ছেয়ে ডুবিয়ে ফেলেছে; তোর ঐ বেদন-রাগ-রঞ্জিত পরশ মণির ছোঁয়া আমারও লৌহ-মর্ম্মকে ব্যথা-কাঞ্চনের অরুণিমায় রাঙিয়ে তুলেছে। ওরে, তাই এ নিস্তব্ধ রাতে বিহ্বল-আমি একা-আমার আজ অন্তরের সত্য—মানবাত্মার সকল ভাবগুলি তোকে জানিয়ে বাঁচলাম। জানি এ চিঠিটা আমার হাত পেরিয়ে গেলেই হয় ত আমার সঙ্কোচ আর অনুশোচনা জাগবে যে, তোকে এমন ক'রে, তোর দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে সজাগ ক'রে দেওয়া বা চোরা ব্যথায় অস্ত্র করা একেবারেই উচিত হয়নি। এ জেনেও আমার পত্র-লেখার বলবতী ইচ্ছাকে রুখতে পারলাম না। কে জানে, আবার আমাদের নব মিলনের আনন্দ-ভৈরবী আর প্রভাতীর কল-মুখর রাগিণী কোন প্রভাতে বেজে' উঠবে কি না! আঃ, তার চিন্তাটাও কত ব্যথা-কাতর কান্নায় কান্নায়। হায় ভাই, সে দিন কি আর আসবে?

বাড়ীর খবর সব ভাল। মাহ্‌বুবা বিবি বর্ত্তমানে মাতুলালয় বাসিনী। মুসোফিয়া বিবি তেপসে'-যাওয়া মাল্‌সার মতন নাকি আজকাল মুখ ভার করে থাকেন। রবিয়ল সাহেবের এসরাজ সারেঙ্গীর কোঁকানী একটু মন্দা পড়ছে। আমার এখন লেখা-পড়ার চিন্তার চেয়ে বোঝা-পড়ার চিন্তাটাই বেশী—ঐ যাঃ, একটা হুতুম-প্যাঁচা ডেকে উঠলো রে—বড্ডো অলুক্ষণে ডাক!—শুয়ে পড়ি ভাই, মাথা নুয়ে আসছে!

তোমার বিয়োগ-কাতর

মনুয়র

(৮)

করাচি সেনা-নিবাস,
(শ্রীঘর)
১৭ই ফেব্রুয়ারী,

বাঁদর মনো !

শুয়োর পাজি-ছুঁচো উল্লুক-গাধা ড্যাম-ব্ল্যাডি-ফুল-বেল্লিক বেলেল্লা উজবক্-বেয়াদব-বেতমিজ্ !—ওঃ, আর যে মনে প'ড়ছে না ছাই, নৈলে এ চিঠিতে অন্য কিছু না লিখে শুধু হাজার খানেক পৃষ্ঠা ধ'রে তোকে আষ্টে-পিষ্ঠে গা'ল দিয়ে তবে কখনো ক্ষান্ত হ'তাম ! একটা অভিধানও পাবার যো নেই এই শালার জিন্দান্ খানায়, নৈলে দিন-কতক ধ'রে এমনিতর চোখা চোখা গা'ল পছন্দ ক'রে তোকে বিঁধতাম যে, যার জ্বলনের চোটে তুই বিছুটি-আল্-কুসি-লাগানো ছাগলের মতন ছুটে বেড়াতিস --আর তবে না আমার প্রাণের জ্বালা হাতের চুলবুনী কতকটা মিটতো ! আচ্ছা, তোদের ভাই-বোন সবারই ধা'ত কি একই রকমের? তোদের ধর্ম্মই কি মরার ওপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া ? তোরা কি সুখ পাস এমন বে দিলের মতন বেদনা-ঘায়ে ভোঁতা ছুরি রগড়ে ? বল, ওরে হিংস্র জানোয়ারের দল, বল এতে তোদের কোন জিঘাংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হয় ! কি ব'লবো, ভাগ্যিস তুই আমার হাতের নাগালের মধ্যে নেই, নৈলে কামড়ে তোমার বুকের কাঁচা মাংস তুলে ছাড়তাম ! হায়, আমার জান যে আজ কি রকম তড়পে তড়পে উঠছে তোদের এই মুর্গী পোষা ভালোবাসার জুলুমে, তার, ভাষায় ব্যক্ত ক'রতে না পেরে শুধু এই চিঠির কাগজটাকে কামড়িয়ে — নিজের হাতের গোশত নিজে চিবিয়ে আমার অতৃপ্ত রোষের ক্ষোভ মিটাচ্ছি ! এখন আমার মনে হ'চ্ছে, হনুমানের সাগর-লঙ্ঘনের মতন মস্ত এক লাফে এই দু'হাজার মাইল ডিঙিয়ে তোর ঘাড়ের ওপর হুড়মুড় ক'রে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তোকে একদম 'কীচক-বধ' ক'রে ফেলি। তোর ঐ বাকুড়া কলেজটাকে গন্ধ-মাদন পর্ব্বতের মতন চড়্-চড়্ ক'রে উপড়ে' ফেলে' সটান গন্ধেশ্বরীর গর্ভে নিয়ে গিয়ে ফেলি। তার পর, ভাবী সাহেবার ঘরটা শুদ্ধ সারা সালারটাকে অযুত বিস্মবিয়াসের অগ্নিস্রাবে একদম নেস্ত্-নাবুদ' ক'রে ফেলি। ভারি সব পণ্ডিত মনস্তত্ত্ববিদ্ কিনা, তাই সব ডেঁপোমী ক'রে চিঠি লেখা ! আমি নিজেকেই বা

আর কি ব'লবো, তোদের একটু পথ দেখাতেই তোরা খাইবারপাশ' এর মধ্যেই গোরা সৈন্যের মতন সেই পথ দিয়ে অবিশ্রান্ত গোলাগুলি বর্ষণ ক'রে আমাকে ঘায়েল ক'রে ফেললি। যত দোষ এই আমি-শালার। তোর আগেকার চিঠিটা পেয়ে খুশী হ'য়ে যে উত্তর লিখেছিলাম, তা আলসে'মী ক'রে আর ডাকে দিইনি, তার পর তোর পরের বিশ্রী চিঠিটা পেয়েই তখখুনই সে চিঠিটা ছিঁড়ে কুটিকুটি ক'রে ফেলেছি। মনে ক'রেছিলাম তুই ভালো,—আরে 'তওবা'! সব শিয়ালের একই ডাক! পরের চিঠিটার পুরো উত্তর যে এখন দেবই না, তা বোধ হয় আর লিখে জানাবার দরকার নেই। যদি কোন দিন আমি শান্ত হ'য়ে তোর অপরাধ ক্ষমা ক'রতে পারি, তবেই উত্তর দেবো—নৈলে নয়। ভাবী সাহেবার চিঠিও তোরই মত 'রাবিশ'-যত-সব মন-গড়া কথায় ভরা। হবেনা? হাজার হোক, তিনি ত তোরই বোন। আর কাজেই 'তুইও যে তাঁর সহোদর, তা' মর্দ্দের মতই প্রমাণ ক'রলি।…খোদা তোদের মঙ্গল করুন!

তোদের খবর যদি ইচ্ছা করিস, দিতে পারিস। চিঠি-পত্র বন্ধ ক'রলে বা খবর না পেলে যে খুব বেশী চিন্তিত হব তা ভুলেও মনে করিসনে যেন। সে দিন আর নেই রে মনু সেদিন আর নেই। এখন সারা দুনিয়া গোল্লায় গেলেও আমি দিব্যি শান্তভাবে পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিতে থাকবো। জাহান্নামে যাক তোর দুনিয়া। আমার তাতে কি? দুনিয়ার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি, যে, আমি তার জন্যে ঝুরে' ম'র্‌বো? মনে রাখিস,—দুনিয়া যদি হয় বুনো ওল, তবে আমি বাঘা তেঁতুল; দুনিয়া যদি হয় সাপ, তবে আমি নেউল. দুনিয়া যদি হয় রাধা-শ্যাম, তবে আমি শ্রী কাঁধে-বাড়ি বলরাম।… আর কত ব'লবো? কতই বা যা' তা ব'কবো! এক কথায়, আমি এখন থেকে সংসারের মহা শত্রু! সে যদি যায় পুবে আমি যাব পশ্চিমে! এই সত্যি করে দুনিয়ার সঙ্গে দুষমনী পাতালাম, দেখি কে হারে—কে জিতে!…দূর ছাই! রাজ্যের ঘুমও আসছে যেন একেবারে আফিমের নেশার মত হ'য়ে—একেবারে মরণ-ঘুম এলেও ত বাঁচি! আর, ঘুমকেই বা দোষ দেবো কি! হাবিলদারজী আজ যে রকম দু-ঘণ্টা ধ'রে আমায় মাটী খুঁড়িয়েছে! এমন 'কেটো' হাতেও ফোস্‌কা পড়িয়ে তবে ছেড়েছে!—হাঁ, এই হাবিলদার কিন্তু এক ব্যাটাছেলে বটে! একেই ত ব'লতে হয় সৈ—নি—ক পু—রু—ষ! আমায় পুরো দুটী ঘণ্টা গাধার চেয়েও বেহেজ্ খাটিয়েছে, একবার কপালের ঘাম মুছতেও দেয়নি —এমনি জাঁক! অত কষ্টের মধ্যেও আমার তাই একটা তীব্র তীক্ষ্ণ আনন্দ

শিরায় শিরায় গরম হ'য়ে ছুটে বেড়াচ্ছিল, এবং তা' এই ভেবে যে, আহা আর কেউ ত এমন ক'রে দুঃখ দিয়ে আমার সব কিছু ভুলিয়ে দেয় না ! এমনি কঠোরতা—না, এর চেয়েও সাংঘাতিক পুরুষতা—আমি সব সময় চাইছি, কিন্তু পাই খুব কম ! তাই আমার শাস্তির দরুণ ঐ দুঘণ্টা খাটুনী হ'য়ে যাবার পর আমি হাবিলদার সাহেবের পাটাতন করা বুকে জোর দুটো থাপ্পড় কসিয়ে বাহবা দিয়েছিলাম ; তীক্ষ্ণ উৎসাহের চোটে থাপ্পড় দুটো এতই রুক্ষ্ম আর বে-আন্দাজ ভারী হ'য়ে প'ড়েছিল যে, তাঁর চোখে সত্য সত্যই 'ভুগ্‌জুগুনি' জ্ব'লে উঠেছিল। তাঁর চোখের তারা আমড়ার আঁটির মতন বেরিয়ে প'ড়লেও লজ্জার খাতিরে তিনি 'কিছুই হয়নি' ব'লে কাপাস-হাসি হাসতে চেষ্টা ক'রেছিলেন ! পরে কিন্তু তিনি সানন্দে স্বীকার ক'রেছেন যে, আমি বাস্তবিক তাঁকে একটু বেশী রকমেই বে-সামাল ক'রে ফেলেছিলাম এবং তিনি এখন বিশ্বাস করেন যে, এ-রকম কারে প'ড়লে দিনেও তারা দেখা যেতে পারে ! তবু এই হাবিলদারজীকে বাহাদুর পুরুষ ব'লতে হবে ; কারণ অন্যান্য নায়ক হাবিলদারদের মতন সে অপরাধীকে না খাটিয়ে বসে' থাকতে দিয়ে সৌজন্য প্রকাশ করে না—কর্ত্তব্যে অবহেলা করে না। তাই আমাদের সৈনিক-সঙ্ঘ এঁর নাম রেখেছে পাষণ্ড দুষ্‌মন শিং। এ বেচারা লেখা-পড়া জানে কম, "নাচো কুঁদো ভুলো মৎ" অর্থাৎ কাজের বেলায় ঠিক—একদম ঘড়ির কাঁটার মত ! তাই আমাদের শিক্ষিত হাম্‌বাগের দল এখনো সাধারণ সৈনিক এবং ইনি শীগগিরই ভারপ্রাপ্ত সেনানী হ'তে যাচ্ছেন।...পল্টনে এসে গাফেলীই ত এক মহা অন্যায়, তার ওপর ব্যাটা ছেলের আবার দুর্ব্বলতা দেখ দেখি—পাছে বাঙলার ননীর পুতুলদের নধর গায়ে একটু আঁচ লেগে তা গ'লে যায়, তাই তাঁদের কাজ থেকে রেহাই দিয়ে উচ্চ সেনানীদের দিনকাণা করা হয়। যেই কোন লেফটেন্যাণ্ট কাজ দেখতে আসেন, অমনি তারা এমনি নিবিষ্ট মনে, এত জোরে কাজ ক'রতে থাকেন যে তা দেখে স্বয়ং ব্রহ্মারও "সাবাস জোয়ান্" বলবার কথা ! কিন্তু সে যখন দেখে যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যা কাজ হওয়া উচিত ছিল, তার এক চতুর্থাংশও হয়নি তখন বেচারার বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না ! গভীর গবেষণা ক'রেও তার গোবরগাদা মগজে এর কারণটা আর সেঁদোয় না—আর কাজেই তাকে ব'লতে হয় "বাঙালী যাদু জান্‌তা হায় !" অবশ্য সবাই নয়, কিন্তু এই রকম ক'রে অনেকেই বাঙালী ছেলেগুলোর কাঁচা মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে। কাজেই আমার সঙ্গে এই ধরনের সব সৈনিকের প্রায়ই মুখোমুখি এবং সময়ে সময়ে হাতাহাতিও হ'য়ে যায়, আর শাস্তি ভোগটা ক'রতে হয় আমাকেই সব্‌সে জিয়াদা ! রাজার জন্যে কাজ না-ই করলি, কিন্তু এও ত

একটা শিক্ষা। যে-সামরিক শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য বাঙালী এই প্রথম লাভ ক'রেছে, তাকে এই রকম নষ্ট হতে দেওয়া কি বিবেকসম্মত? আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত সামরিক শিক্ষাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশের লোকের এত আশা, আমাদের প্রতি তাঁদের এত স্নেহ-আদরের সম্মান আমাদের প্রাণ দিয়েও রাখতে হবে। প্রাণ ত দিতেই এসেছি, তাই ব'লে লক্ষ্যচ্যুত হ'লে চ'লবে কেন? এ ভীরুতা যে সৈনিকের দুরপনের কলঙ্ক!...পুরুষ কা বাচ্ছা পৌরুষকে বিসর্জ্জন দেব কেন? সৈনিকের আবার দয়া মায়া কিসের? সিপাই-এর দিল্ হবে শক্ত পাথর, বুক হবে পাহাড়ের মতন অটল, আর বাহু হবে অশনির মতন কঠোর!—গর্দ্দানে একটা 'রদ্দা' বসালেই যেন বুঝতে পারে, হাঁ পৃথিবীও ঘোরে, আর স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ব'লেও তিনটে ভুবন আছে! মরদের যদি মর্দ্দানীই না রইল তবে ত সে নি-মোরাদে। মানুষের এ রকম 'মাদিয়ানা' চাল দেখে মর্দ্দানী আজকাল বাস্তবিকই লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না।

তার পর, আমার জন্যে বিশেষ কোন চিন্তিত হবার দরকার নেই এখন সম্প্রতি মাস খানেকের জন্যে। কারণ গত পরশু এক শুভলগ্ন আমি আমার কোম্পানীর সেনানী এক কাপ্তেন সাহেবকে একই ঘুঁষিতে 'চাঁদা মামা' দেখিয়ে এখন বন্দীখানায় বাস ক'রছি। বড় দুঃখেই তার সঙ্গে এ রকম খোট্টাই রসিকতা করতে হ'য়েছিল, কেন না তিনি কিছু দিন থেকে নাকি আমার প্যারেড্ ও কাজে অসাধারণ চটক, নৈপুণ্য এবং কর্ত্তব্য-পরায়ণতা দেখে আসছিলেন, তাই সে দিন যখন মেসোপোটেমিয়া যাবার জন্যে আমাদের 'বিবাহের' খাকী-চেলী পরিধান পূর্ব্বক নববধূর মত আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে আড়-চোখে-চোখে আমাদের পতি-দেবতাস্বরূপ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের শুভাগমন প্রতীক্ষা করেছি আর ঘেমে তেতে' লাল হ'চ্ছি—অবশ্য লজ্জায় নয়, খর চাঁদি ফাটা রোদ্দুরের তাপে—তখন হঠাৎ তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আমাদের কোম্পানীর সুবাদার সাহেবকে ব'ললেন যে আমার মেসোপোটেমিয়া যাওয়া হবে না, নতুন রংরুটদের শিক্ষা দেবার জন্যে করাচিতেই থাকতে হবে এবং আমাকে ঐ খেসারতের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ লান্স্ নায়কের পদে উন্নীত করা হবে। কথা শুনে আমার অঙ্গ জুড়িয়ে গেল আর কি! তাই তাঁর এ অন্যায় আবদারের প্রতিবাদ করায় তিনি বেদম খাপ্পা হ'য়ে চোখ রাঙিয়ে উঠলেন,—"মেরা হুকুম হায়।" তোর হুকুমের নিকুচি করে ছি। জানিস্ ত পুরুষের রাগ আনা গোনা করে'—তাই যেই দাঁত খিঁচিয়ে উঠেছে, অমনি চোস্ত গোছের পরিপক্ক একটী ঘুঁসি সাহেবের বাম চোয়ালে,—তিনিও অবিলম্বে 'পপাত ধরণীতলে' এবং সঙ্গে সঙ্গে 'পতন ও মূর্চ্ছার'হাতে কলমে অভিনয়। তার পর, আমায় ঠেলে

ঢোকানো হল "কোয়ার্টার গার্ডে" বা সামরিক হাজতে, তারপর বিচারে ২৮ দিনের সশ্রম কারাদণ্ড ও সামরিক গারদখানায় বাস। কুছ্ পরোয়া নেই। আমি এই সশ্রম কারাদণ্ডকে ভয় করলে আর জান দিতে আসতাম না। দুঃখ কষ্টই ত আমার অপার্থিব চিরদিনের চাওয়া-পাওয়া ধন। ও যে আমার অলঙ্কার! তাই হাসিমুখেই তাকে বরণ ক'রে নিয়েছি! আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ আমায় জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, আমি সাহেবকে ও-রকম আপ্যায়িত ক'রেছিলাম কেন? তাতে আমি শুধু এইটুকু ব'লেছিলাম,—"সাহেব! সৈনিক হ'য়ে এসেছি মারামারি ক'রবার জন্যেই, প্রেম ক'রবার জন্যে নয়!" তা ছাড়া, দেখনা ভাই একে আমার মনের ঠিক নেই এবং মনের সে তিক্ত ভাবটাকে কোনরূপে চাপা দিতে চাইছিলাম দু'দিন বাদে আগুন দেখতে পাব এই আনন্দে — আর ঠিক সেই সময় কিনা তিনি এসে আমায় "কেতার্থ" ক'রে দিলেন!

অতএব এখন কি ক'রে আমার দিন কাটছে, আন্দাজেই মালুম করে নিতে পারবি। কিন্তু সে রকম ভাবতে পারাটাও তোমাদের অ-সামরিক লোকের পক্ষে এক রকম অসম্ভব ব্যাপার; কারণ সৈনিকের খাটুনী ধ্বস্তাধ্বস্তি কুস্তাকুস্তিও দেখনি এবং তাদের মিলিটারী শাস্তি বা গারদখানার ধারণাও তোমাদের বুদ্ধির অতীত এ আমি হলফ ক'রে ব'লতে পারি। এখন খোদার নাম নিয়ে ভোরে উঠেই আমার গারদের ভিতর ব'সে হাত-পায়ের শিকলগুলোয় ঝঙ্কার দিই। আহ্ সে কি মধুর বোল! আমার কাণে তো যে-কোনো তিলোত্তমা-তুল্য ষোড়শী কুমারীর বলয় নূপুর ও রেশমী চুড়ির মধু শিঞ্জনের চেয়েও মিষ্টি হ'য়ে বাজে। তার পর শ্রীমান গুপীচন্দ্রের শিঙের (বিউগল) আওয়াজ 'কখন শুনি কখন শুনি' ক'রে যুগল কর্ণ উৎকর্ণ হয়ে ওঠে! রাই বিনোদিনীর মতই আহম্ জুবন্দিনী তখন হাঁস-পাঁশ ক'রে ঘন শ্বাস ফেলতে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে বুকের বসনও ভীতি-সঙ্কোচে আন্দোলিত হ'তে থাকে এবং আয়ান ঘোষ-রূপ এই লান্স্-নায়েক নারায়ণ ঘোষের গোয়ালে বা গারদঘরে বসে শুনি,—ঐ বুঝি বাঁশী বাজে!" অবিশ্যি, তা বন-মাঝে নয়, সন্ত্রস্ত মন মাঝে!—হায়, সে কোন শ্যাওড়া তলায় হেলমেট-চূড়া-শিরে রাইফেল বংশী হাতে আমার সান্ত্রী-কালাচাঁদ ত্রিভঙ্গ ঠামে দাঁড়িয়ে আছেন! আমার এই শ্যামকান্তের ত্রিভঙ্গ নাম সার্থক, কেননা বুটপট্টি পরার পর তাঁকে ঠিক তিন জায়গায়ই ভঙ্গ ব'লে মনে হয়, প্রথম পট্টি-লেপ্‌টানো পায়ের উপরে হাঁটুতে 'দ'-এর মত একটা ভঙ্গ; দ্বিতীয়; তাঁর কোমর কোমর-বন্ধনের বাঁধনের ঠেলায় এবং কতকটা স্বভাবতই ভঙ্গ; তৃতীয়, তাঁর স্বর ভঙ্গ! আরো আছে,—তার পৃষ্ঠদেশ অষ্টাবক্র মুনির মতন বাঁকা ব'লে আমরা তাঁর নাম দিয়েছি "ফ্লাগব্রোকেন" অর্থাৎ ধ্বজ-ভঙ্গ! কিন্তু ঐ অষ্টবক্রীয়-

ভঙ্গটাও হিসেবের মধ্যে ধ'রলে উনি চতুর্ভঙ্গ হ'য়ে যান ব'লে ওটা এখন ধরতার মধ্যে ধরিনে।·· হ্যাঁ, তার পর আমায় কি ক'রতে হয় শোন। শ্রীদাম-রূপ ধড়াধারী তাঁর এক সখা এসে আমায় কালার গোষ্ঠে নিয়ে যান; আমিও মহিষ-গমনে আনত নেত্রে তাঁর অনুগমন করি। পথের মাঝে আমার লাজ বিজড়িত শৃঙ্খল-পরা চরণে পঞ্চমে-বোলা বাণী বেজে ওঠে, —"রিণিকি ঝিণিকি রিণি ঝিনি রিণি-কিনি ঝিন্নিরে!" তার পর এই মুখর "মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে," পথের যুবক বৃন্দকে চকিত ক'রে গোষ্ঠে নিয়ে ঘন্টা দুই গোষ্ঠবিহার। অর্থাৎ শ্যামের হুকুম মত সামনের একটা ছোট্ট তাল-তমালহীন পাহাড় বার-কতক দৌড়ে' (ডবল মার্চ ক'রে) প্রদক্ষিণ ক'রে আসা—সেই দৌড়ানোর মাঝে মাঝে "ডবল মার্ক টাইম" করা বা শিব ছাড়া যে সৈনিকেও তাণ্ডব নৃত্য করতে পারে, তা দেখিয়ে দেওয়া,—মধ্যে পরিখা-খাল ডিঙিয়ে মর্কট-প্রীতি প্রদর্শন করা ইত্যাদি! এ সব লীলারে লীলা, একেবারে রাসলীলা! এই দুই ঘন্টা অমানুবিক কসরতের পরেও যখন পৈতৃক, প্রাণটা হাতে করে ঘরে ফিরি, তখন স্বতই মনে হয়—নাঃ, 'শরীরের নাম মহাশয়' হওয়াটা কিছুই বিচিত্র নয়। এ মহাশয়কে যা সওয়াবে তাই সয়। তার পর বেলা এগার বারোটায় যে আ-কাঁড়া রেঙ্গুনী চালের সফেন ভাতের মণ্ড আর আ-ছোলা আলুর ঘেঁট খেতে পাই, তা দেখে আমরা বলদের চেয়ে উচ্চ শ্রেণীর জীব বলে ত মনে হয় না। ডাল যা দু-এক দিন হয়, তাতে নাকে কাণে সরষের তেল দিয়ে ডুব মারলেও কলাই-এর সন্ধান পাওয়া যাবে না! সকালে একবার ভেলী গুড় দিয়ে তৈরী এক হাতা যা চা পাই, তা না ব'লে দিলে বহু গবেষণাতেও কেউ চিনতে পারবে না যে এ আবার কোন চীজ! এ যেন রোগীকে জবরদস্তি ক'রে পথ্য গেলানোর মত, "খাবি ত খৈ খা, না খাবি ত খৈ খা।" যা হোক, অতক্ষণ খাবি-খাওয়ার পর ঐ জাব খাওয়াই তখন পরম উপাদেয়, অমৃত বলে বোধ হয়। তার পর একটু বাদেই পাথর কুড়ানো, ভাঙানো, আবার সন্ধ্যায় ঐ রকম প্যারেড বা গোষ্ঠবিহার এবং আরো কত বিশ্রী সুশ্রী কাজ। সে সব শুনলে তোমার চক্ষু কাঁকড়ার মতন কোটরের বাইরে ঠেলে বেরিয়ে পড়বে।—তবু কিন্তু বুক ফুলিয়ে বলচি বেড়ে আরামেই আছি। আমি এই পিঁজরা পোলে আটক থেকেও কি করে হরদম গান গাই, তা এখানকার সাস্ত্রীরা তো বুঝে উঠতেই পারে না। এই দ্যাখ না, তোকে চিঠি লিখতে বসেছি—আর সঙ্গে সঙ্গে গানও ধরে দিয়েছি,—

"আরো আঘাত সইবে আমার সইবে আমারো,
আরো কঠিন কঠিন তারে জীবন তারে ঝঙ্কারো!"

এই রকমে আমার দিনগুলো যাচ্ছে, ''আদম-গাড়ী''র (রিক্‌শ) মতন এক ঘেয়ে হচং হচং ধাক্কা খেয়ে খেয়ে।

শুনছি, কয়েদ হওয়ার দরুণ আমায় নাকি যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতে দেওয়া হবে না। যদি তা হয়, তা' হ'লে আর এক কাণ্ড ক'রে ব'সে থাকবো। তা' এখন ব'লছিনে। এ ব্যাটারা ত বুঝবে না যে, আমি কি জন্যে পল্টনে এসেছি। তাই সকলেই আমাকে শুধু ভুল বোঝে! অধিকাংশ সৈনিকই যখন পদোন্নতির জন্য লালায়িত, তখন আমাকে প্রমোশন দিতে গেলেও আমি নিইনা দে'খে ওরা আমাকে 'কাঠখোট্টা' 'গোঁয়ার' 'হোড়' প্রভৃতি দুষ্পাচ্য গালাগালি দেয়। কিন্তু আমি জানি, দঃখকে পাবার জন্যেই আমি এমন ক'রে বাইরে বেরিয়েচি। আমি রাজা ও দেশের জন্যে আসিনি। অত বড় দেবতা বা স্বার্থত্যাগী মহাত্মা হ'য়ে উঠতে পারিনি এখনো; আত্মজয়ই ক'রতে পারলাম না আজো, তা আবার দেবতা! তাই আজো আমি রক্তমাংসের গড়া গোঁয়ার গর্দ্দভ মানুষই র'য়ে গেলাম!...পরে বরং দেবতা হবার অভিনয় ও কসরত' ক'রে দেখা যাবে, যদি এই দুঃখ কষ্ট বেদনার আরাম আর আনন্দকে এড়িয়ে চ'লতে না হয়। কেননা শুনেছি দেবতাদের দুঃখ কষ্ট বেদনা-ব্যথা ব'লে কোন জিনিস জানা নেই, যদি তাই হয় তবে ও আনন্দ-বিহীন নির্ব্বিকার দেবত্বকে দূর থেকেই হাজার হাজার সালাম। যদি দুঃখই না পাওয়া গেল জীবনে, তবে সে জীবন যে বে-নিমক, বিস্বাদ! এই বেদানর আনন্দই আমাকে পাগল ক'রলে, ঘরের বাহির ক'রলে বন্ধন-মুক্ত রিক্ত করে ছাড়লে; আর আজো সে ছুটেছে আমার পিছু পিছু উল্কার মত উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে! দুঃখও আমায় ছাড়বে না, আমিও তাকে ছাড়বো না। সে যে আমার বন্ধু—প্রাণপ্রিয়তম সখা—আমার ঝড়-বাদলের মাঝখানে নিবিড়-করে পাওয়া সাথী! এ পাওয়ার আনন্দের যে তীব্র নির্ম্মমতা ভরা মাধুর্য্য, তাকে এড়িয়ে যাবার সব শক্তি ঐ পথে-পাওয়া বন্ধু দুঃখই হরণ ক'রেছে। তাই বাউল গানের অলস সুরে সামনের উদাসীন পথে আমার ক্রন্দন-আনন্দ একটা একটানা বেদনা সৃজন ক'রে চ'লেছে, দিগন্তের সীমা ছাড়িয়ে অনন্তের পানে প্রসারিত হয়ে গেছে সে-পথ। বুকের ভিতর ক্রন্দন জাগে তা'র সেই চিরন্তন প্রশ্ন নিয়ে, ''এ পথ গেছে কোনখানে গো কোনখানে?'' মূক পথের সীমাহীন আধ-আবছায়া আঁখির আগে ক্লান্ত চাওয়ার মৌন ভাষায় কইতে থাকে, ''তা' কে জানে, তা' কে জানে!'' এই অশেষের শেষ পেতে ততই প্রাণ আকুলি-বিকুলি- ক'রে ওঠে। তা'তেও কত আনন্দ! এই যে নিরুদ্দেশ যাত্রা আর পথহীন পথচলার গূঢ় আনন্দ, তা থেকে আমার

অতৃপ্ত আত্ম-তৃপ্তিকে বঞ্চিত ক'রবো কেন? তোরা অনুভূতিহীন আনন্দ বিহীন পাথরের ঢেলা, হয় ত একে "সোণার পাথর বাটি" বা "কাঠালের আমসত্ব"-এর মতই একটা অর্থহীন অনর্থ মনে করে প্রশ্ন ক'রবি, "যার সীমা নেই, শেষ নেই সে অজানার পেছনে ছোটার আবার আনন্দ কি?" ঐ ত মজা! এই অসীমের সীমা খোঁজায়, নিরুদ্দেশের চেষ্টায় যে দীর্ঘ অতৃপ্তির আশা আনন্দ, সেই ত আমায় উগ্র আকাঙ্খার রোখ চড়িয়ে দিচ্চে। শেষ হ'লে যে এ পথ চলারও শেষ, আর আমার আনন্দেরও শেষ, তাই আমি পথ চলি আর বলি,—যেন এ পথের আর শেষ না হয়। পাওয়ার আনন্দের শান্তির চাইতে, তাই আমি না-পাওয়ার আনন্দের অশান্তিকেই কামনা করে আসছি। যার জন্যে আমার এই অগস্ত্য-যাত্রা আমার সেই পথ-চাওয়া ধনকে কি এই পথের পারেই পাব? সেও কি তবে আমার আশায় এই সীমার শেষে তার অনন্ত যৌবনের ডালি সাজিয়ে জন্ম জন্ম প্রতীক্ষা করে কাটাচ্ছে? শুধু আমিই তাকে পেতে চাই? সে কি পথ চলে না আমার আশায়? না, না, সেও পেতে চায়, সেও পথ চলে; নৈলে কে আমায় আকর্ষণ ক'রবে এমন চুম্বকের মত? কিসের এমন উন্মাদনা-স্পন্দন আমার রক্তে রক্তে টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটছে?—তার বাঁশী আমি শুনেছি, তাই আমার এ অভিসারে যাত্রা। আমার বাঁশী সে শুনেছে, তাই তারও ঐ একই দিক-হারা পথে অভিসার যাত্রা। আমি ভাবছি আমার এ-যাত্রার শেষ ঐ পথের অ-দেখা পথিকের কুটির-দ্বারে, —পথের যে-মোহনায় গিয়ে পথহারা পথিক ঐ চেনা বাঁশীর পরিচিত বেহাগ সুর স্পষ্ট শুনতে পায়। সে বেহাগ-রাগে মিলনের হাসি আর বিদায়ের কান্না আলো-ছায়ার মত লুটিয়ে পড়ে চারিপাশের পথে। কারণ, ক্লান্ত পথিক এই চৌমাথায় এসে মনে করে, বুঝি তার চলার শেষ হ'ল; কিন্তু সেই পথেরই বাঁক বেয়ে বেহাগের আবাহন তাকে অন্য আর এক পথে ডেকে নেয়। তারপর সকালের পথ তাকে বিভাসের সুরে, দুপুরের পথ সারেঙ্ রাগে আর সাঁঝের পথ পূরবীর মায়াতানে পথের পর পথ ঘুরিয়ে নিয়ে যায়! হায়, একি গোলক ধাঁধা? কোথায় সে বন্ধু যার বাঁশী নিরন্তর বিশ্বমানবের মনের বনে এমন ঘরছাড়া ডাক ডাকচে? যার অশরীরী ছোঁওয়া শয়নে স্বপনে জাগরণে সারা ক্ষণই বাইরে ভিতরে অনুভব ক'রছি, যে শুধু দুষ্টুমী ক'রে পথই চলাচ্ছে, ধরা দিয়ে ধরা দিচ্ছে না? পেয়েও তবে এই না-পাওয়ার অতৃপ্তি কেন? এর সন্ধান কে দেবে? যে যায়, সে ত আর ফেরে না। এ অগস্ত্য-যাত্রার মানে কি?

দুঃখ ব'লেছে সে আমাকে ঐ পথের শেষ দেখাবে। সে নাকি আমার ঐ বধুয়ার সখা। কোন পিয়াল বনের স্যামলিমার আড়ালে লুকিয়ে থেকে সে চোর চপল তার বাঁশী বাজাচ্ছে, তাই সে দেখিয়ে দেবে! তার সাথে গেলে সে এই লুকোচুরি ধরিয়ে দেবে। তাই দুঃখকে বরণ করেছি, তাকেই আমার পথের সাথী ক'রেছি! সুখে ক্লান্তি আছে এ দুঃখে তা নেই; এর বেদনা একটা বিপুল অগ্নি-শিখা বুকের মাঝে জ্বালিয়েই রেখেছে—সে শিখা ঝড়ে নেবে না, বাদল-বর্ষায় ঠাণ্ডা হয় না। এই আগুন-শিখার নামই অশান্তি। আমার জীবন-প্রদীপ ততক্ষণই জ্বলচে আর জ্বলবে যতক্ষণ এই অশান্তির 'রওগান' বা স্নেহ পদার্থ এই প্রদীপকে জ্বালিয়ে রেখেছে আর রাখবে! আগুন, ঝড়-ঝঞ্ঝা বৃষ্টি, বিদ্যুৎ বজ্র, আঘাত, বেদনা—এই অষ্টধাতু দিয়ে আমার জীবন তৈরী হ'য়ে যা হ'বে দুর্ভেদ্য—মৃত্যুঞ্জয়—অবিনাশী! আমার এ পথ শাশ্বত সত্যের পথ;—বিশ্বমানবের জনম ধরে চাওয়া পথ। আমি আমার আমিত্বকে এ পথ থেকে মুখ ফিরাতে দেবো না। পথ-বিচ্যুতি ঘটাতে সুখ ত প্রলোভন দেখাবেই; কেননা তার দুষমন 'দুঃখ' যে আমার সাথী; কিন্তু আর ফিরছিনে। এই যে দুঃখের বুক আঁকড়ে ধরেছি, এ আর ছাড়ছিনে। আমি আজ আমার এই বিশ বছর বয়সের অভিজ্ঞতা এবং দশ-বিশে দু'শ বছরেরও বেশি আঘাত বেদনা নিয়ে সত্য ক'রেই বুঝেছি যে, দুঃখী যখন আনন্দকে পেতে সুখের পেছনে মরীচিকা-ভ্রান্ত মৃগের মতন অনুসরণ করে, তখন সে তার দুঃখের দৌলতে যে আনন্দটুকু পেয়েছিল তা ত হারায়ই, উল্টো সে আরো অনেকখানি পেছনে সে-সোয়াস্তির গর্ত্তে গিয়ে পড়ে! তার পর তাকে আবার সেই আগে-চলা দুঃখের পথ ধরেই চ'লতে হয়। মৃগ-তৃষ্ণিকার মত সুখ শুধু দূর তৃষিত মানবাত্মার ভ্রান্তি জন্মায়, কিন্তু সুখ কোথাও নেই—সুখ ব'লে কোন চীজের অস্তিত্বও নেই, ওটা শুধু মানুষের কল্পনা, অতৃপ্তিকে তৃপ্তি দেবার জন্যে কান্নারত ছেলেকে চাঁদ ধরে দেবার মত ফুসলিয়ে রাখা।—আত্মা একটু সজাগ হলেই এ প্রবঞ্চনা সহজেই ধরতে পারে।—

ওঃ! মাথাটা বড্ডো দপ্‌দপ্‌ করছে রে। গাটাও শির শির ক'রছে। কি লিখতে গিয়ে কি যে ছাই-পাশ একঝুড়ি বাজে বকলাম' তা ভেবে উঠতে পারছিনে। চিঠিটা আর একবার যে পড়ে দেখতে পারবো তারও কোন আশা নেই, এমনি শরীর-মনে অবসাদ আসছে। তার ওপর আবার আর এক জুলুম। করাচিতে এখন খুব বসন্ত আরম্ভ হ'য়েছে, খোদা এখন দুনিয়ার কিছু খরচ কমাতে ইচ্ছে করেন বোধ হয়। বসন্ত-রোগাক্রান্ত রোগীর চেয়ে যাদের বসন্ত হয় নি, তাদের জুলুমেই আমরা শুদ্ধ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি আমাদের

লাইনের ওপারেই 'সোলজার বাজার' বলে একটা জায়গা আছে, সেখানের বসন্তভীতু আবাল-বৃদ্ধবণিতা মিলে এমন বীভৎস কণ্ঠে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করে ঢাক ঢোল পিটিয়ে সামনের সাগর শয়ানো নারায়ণকে মুগ্ধ করে প্রসাদ লাভ করবার চেষ্টা করছে যে, নারায়ণের যদি এতটুকুও সঙ্গীত-জ্ঞান থাকে, তা হলে এতক্ষণ তিনি শ্বশুর বাড়ী ক্ষীরোদ সাগরের আয়েশ, লক্ষ্মীর পরিচর্য্যা ইত্যাদি সব কিছু ছেড়ে সোজা আমেরিকা মুখো হয়ে ছুট দিয়েছেন। লক্ষ্মী সম্বন্ধে কিছু বলতে পারিনে, কেননা তান সতীন ব্যতীত তাঁর সঙ্গীত-জ্ঞান সম্বন্ধে আমার সঠিক কোনো খবর জানা নেই। নারায়ণ দেখেন যে, দায়ে দৈবে না পড়লে এই সব মনু-সন্তানগণ তাঁর প্রতি অতি ভক্তি দেখিয়ে চোরের লক্ষণ প্রকাশ করে না বা তাঁর সুখ-নিদ্রায় ব্যাঘাত জন্মায় না, তাই তিনি অনেক সমস্যায় পড়ে যান যে, তাঁর শ্বশুরালয় সমুদ্রের গভীরতা বেশী, না, এই ভক্তগুলির ভক্তির গভীরতা বেশী, আর তাঁর এই রকম সমস্যা সমাধান করতে করতে ততক্ষণে অসহায় মানবকুলের অবস্থা "গুড়োয় মুড়ি দু আঙ্গুল" গোছ হ'য়ে পড়ে এবং তাই তারা খঞ্জনী বাজিয়ে খোল পিটিয়ে ছাগ মোষ বলি দিয়ে জোর চেঁচামেচি আরম্ভ করে দেয়।

যাক্, নারায়ণ ত এখন এই রকম কোনো প্রকারে লট্‌পটিয়ে এক দিকে ছুট দিয়েছেন, কিন্তু এদিকে "গোদের উপর বিষফোড়া"র মত আর এক আপদের আমার নাকের ডগায় অভিনয় হ'চ্ছে। আমাদের খাকী গেরুয়া-ধারী অতি ভক্ত সৈনিকবৃন্দ "হরির কৃপায় দাড়ি গঙ্গায়, শীতকালে খায় শাঁখ আলু" শীর্ষক ভক্তিরসাপ্লুত কীর্ত্তনগানের সাথে সাথে "কাছা খুলে' বাহুতুলে" যে রকম প্রলয়-নৃত্য শুরু ক'রে দিয়েছে, তা'তে নিঃসন্দেহে মহাদেবও তাঁর ভূত প্রেত বলদাদি সহ কৈলাস হিমালয় ছেড়ে এতক্ষণে তিব্বত পেরিয়ে পড়েছেন। খোলের প্রচণ্ড চাঁটির মাঝে মাঝে "গিজাং তাল ভটাভট্" গোছের একটা সমস্বর তীক্ষ্ণ ঋষভ চীৎকারের চোটে "ঐ—নিলে রে" বলে তাঁর ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনীবর্গ যেমন অস্বাভাবিক ছুট ছুটছে' হর-গৌরী-পৃষ্ঠে উর্দ্ধ-লাঙ্গুল বৃষভ সিংহও পিট-টান দিয়েচে তেমনি উল্কা বেগে,—এ আমি আমার মনের চোখে বায়স্কোপের মত সাফ্ দেখতে পাচ্ছি। আজ আমি নেই ব'লে ওদের দলে কেউ আর "ন্যাংটা নিতাই" সাজতে পারেনি! আমার হাত পা নিসপিস ক'রে উঠছে—মনে হ'চ্ছে এই হাজতখানায় লোহার শিকলগুলো ভেঙে ওদের মাঝে গিয়ে এক চোট দড়াম্ দড়াম্ ক'রে উলঙ্গ নাচ নেচে দিয়ে আসি...

থাক্ বাপ্‌স্ ! এ সব প্রলয় কাণ্ড এতক্ষণে একটু শান্ত হ'ল !...

আজ বুঝি অমাবস্যার রাত্তির। নিবিড় কালো যামিনী। আকাশের ছায়াপথ দেখে মনে হ'চ্ছে, ও-ছায়াপথ যেন এই কালো যামিনীর সিঁথি পাটি-পরা সিঁথি। অস্তোন্মুখ সন্ধ্যে-তারা সেই সিঁথির মুখে সতীর কপালে সিন্দুর বিন্দুর মত রক্তরাগে জ্বলছে ! তার এলিয়ে দেওয়া কালো চুলের মাঝে মাঝে তারার ফুল গোঁজা রয়েছে। আকাশ-বেয়ে পড়া ঐ গভীর কালো এলো কেশের কুঞ্চিত রাশ ধরণীর বুকে মুখে লুটিয়ে পড়েছে। একটা তারা খ'সে প'ড়ছে আর মনে হ'চ্ছে অসম্বৃত এই কালো রূপসীর মাথা থেকে অসাবধানে এক আধটি ক'রে কুসুম খ'সে প'ড়ছে।...কোন্ কান্তের আশায় রজনী রোজ তার এ কালো রূপ নিয়ে অভিসারে বেরোয় ? কেন সে অনন্তকাল ধ'রে এমন যামিনী জেগে আসছে ? কোন আলো-করা-রূপের রাজ-কুমারের আসার আশায় তার প্রতি রজনী এমন ক'রে ভোরের পাণ্ডুর ক্লান্ত হাসিতে মিলিয়ে যায় ? প্রভাতের ভৈরবী-সুর-সিক্ত শীতল বায়ু—হা হা স্বরে যেন তারই না-পাওয়ার নিরাশা-ক্লান্তি আর পাবার আশার আনন্দ ব্যক্ত করে। যামিনীর যেমন এ প্রতীক্ষার অন্ত নেই, আমারও তেমনি এ পথ চলার আর শেষ নেই !...

আমার এত ইচ্ছে ক'রছে এই যামিনী অভি-সারের আশা-নিরাশা নিয়ে একটা সুন্দর কবিতা লিখতে কিন্তু—আরে ওওবা, আমার কবিতা লেখা যা আসে, তা কতকটা এই রকম,—

নেবুর ফুল আর করমচা,
নাও এক কাপ গরম চা !

এইবার 'ক্ষেমা' দিই, হাতে খাঁড় ধ'রে গেল। তোরও নিশ্চয় মুখে ব্যথা ধ'রবে প'ড়তে ! এইবার শ্রান্ত বায়ে ক্লান্ত কায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে !"

যদি কষ্ট দিয়ে থাকি, ক্ষমা করিস।

স্বেচ্ছাচারী—নূরুল হুদা

(ছ)

সালার
১২ই ফাল্গুন

ভাগ্যবতীষু,

আমার বুক-ভরা স্নেহ আশীষ নাও। তার পর কি গো সব 'কলমী লতা' 'সজ্‌নে ফুল-এর দল, বলি—তোমরা যে-লতা যে-ফুলই হও, তাতে আমার

বিশেষ আপত্তি নেই, কিন্তু পথের এই 'আলোক লতা' 'ঘলঘসি ফুল' দু-একটারও ত সেই সঙ্গে খবর নিতে হয়! তাতে তোমার হয়ত কলসীভরা ভালো-বাসাতে খাঁক্‌তি পড়বে না। পোড়া কপাল আমাদের ভাই, তাই আমাদের আর লতা-পাতা ফুল-ফল জুটলো না! সে যাই হোক, এখন তোমার গুর্ব্বী এই গরীব 'ভাবিজী'কে কি এক-আধখানা, চিঠি-পত্তর দেবে? না, তাতে তোমার সখা-সখির মধু-চিন্তায় বাধা পাবে? এখন তোমাদের সই-এ সই-এ কত কথাই না হবে, আমাদের মত তৃতীয় ব্যক্তির তাতে শুধু হাঁ ক'রে চেয়ে থাকাই সার! এখন "সজন্ সজন্ মিল গিয়া, ঝুট পড়ে বরিয়াত!" আচ্ছা, দেখা যাবে,—এক মাঘে শীত পালায় না! যদি তোমায় এই ঘরে আনতে পারি, তা হ'লে এই এক-চোখোমীর হাড়ে হাড়ে শোধ তুলবো। মনে থাকে যেন, আমি এখন এই ঘরের কর্ত্তৃ ঠাক্‌রুণ!

...আহা, যাক ও সব কথা! ভাবীর দাবী নিয়ে ননদের সাথে একটু রঙ্গ রসিকতা ক'রে নিলাম ব'লে তুমি রাগবে না হয় ত? মনে ক'রো না যেন যে, তুমি পত্র দাওনি ব'লে আমি সত্য-সত্যিই রেগেছি বা অভিমান ক'রেছি। আমি এখানে সুখে দু'টো ভাত গিল্‌ছি বলে যে, অন্যের বেদনাও বুঝবো না, খোদা আমায় এমন মন দিয়ে দুনিয়ায় পাঠান নি। তুমি যে কষ্ট পাচ্ছ সেখানে, তাতে আমায় পত্র না দিতে পারাটাই স্বাভাবিক। তবে ফিরতিবারে কোন লোক যদিই আসে আর তুমি সুবিধে ক'রতে পার, তবে অন্ততঃ গোটাকতক জরুরী কথাও লিখে পাঠিয়ো। সে জরুরী কথা আর কিছু নয়, কেবল নূরুর পল্টনে যাওয়ার আগে বা পরে কোন চিঠি-পত্তর খবরাদি রাখ কিনা, তাই একবার লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে আমায় জানিয়ো। অবশ্য, এ রকম অনুরোধ করাটা বেজায় বেহায়াপনা, এর উত্তর দেওয়াটাও তোমার পক্ষে আরো বেশী লজ্জাকর ব্যাপার সন্দেহ নেই, তবু বোন বড় দায়ে প'ড়েই এ রকম বেহুদা অনুরোধ ক'রতে হ'চ্ছে তোমায়। তুমি আমাদের আর নূরুর সমস্ত অবস্থাটাই বুঝছো, কাজেই এ সময়—এ মরণ-বাঁচনের কথায় লজ্জা ক'রলে চ'লবে না। এখন নূরুকে ফিরিয়ে বাঁচিয়ে আনার জন্যে আমাদের চেয়ে তোমার দায়িত্বটাই বেশী,—কেমন? যদি পার, একবার একটা চিঠি দিতে পার তাকে? ইস্ এতক্ষণ বোধ হয় শরমে লাল হ'য়ে উঠেছিস? ওগো, এমন 'পেটে খিদে মুখে লাজ' ক'রলে চলবে না! নিজের জিনিসকে যদি নিজে অবহেলা ক'রে হারাও তা' হ'লে আখেরে পস্তাতে হবে ব'লে দিচ্ছি! তোমার মনের সত্যিকে বাইরে প্রকাশ ক'রবার শক্তি যদি থাকে, তা হ'লে এই লোক-দেখানো লৌকিকতার মুখ রাখতে গিয়ে নিজে ভিখারিণী সাজবে? অবশ্য, আমি তোমাকে প্রেমের

চিঠি লিখতে বলছিনে, শুধু দু-চারটি লাইনে সোজা কথা,—"কেমন আছেন খবর না পেয়ে বড্ডো ছট্‌ফট্ ক'রছি।" ব্যস্। তা হ'লে দেখবি, আমি বলে রাখলাম, এতেই সে খুশীর চোটে একেবারে দশ লাফ মেরে উঠবে।

সব কথা বলবার আগে এইখানে আমার দোষটা আগে প্রকাশ্যে কবুল ক'রে ফেলি, নয় ত তুমি আমার কথার ধরণ-ধারণ দেখে গোলকধাঁধায় পড়ে যাবে। দোষটা আর কিছু নয়, কেবল শোফির বাক্স থেকে তোমার চিঠিটি অতি কষ্টে চোরাই করে পড়ে ফেলেছি। অবশ্য অন্য কাউকে তো দেখাইনি বা শুনাইনি! এটা পড়বার পরে হয় ত দোষের বলে ভাবতে পারি, কিন্তু অন্ততঃ চিঠিটা গাপ্ ক'রবার সময় এ কথাটি মনে হয়নি। পাছে আমার এ রকম ত্রুটি স্বীকারে "ঠাকুর ঘরে কে রে,—না, কলা খাইনি" এরূপ হাস্যাস্পদ কৈফিয়তের সন্দেহ তোমার মনটাকে সশঙ্ক চঞ্চল ক'রে তোলে, তাই এই আগে থেকেই কৈফিয়ৎ কাটালাম। তুমি এতে রেগো না বোন। কারণ আমি নিঃসন্দেহে ঘোষণা করতে পারি যে মেয়েদের এই চুরি স্বভাবটা কিছুতেই যাবে না, তা' তাঁরা এটা এড়িয়ে চলবার যতই কেন কসরৎ দেখান না। "ইল্লৎ যায় ধুলে আর খস্‌লৎ যায় ম'লে" এই ডাক-পুরুষে কথাটি একদম খাঁটি সাচ্চা বাত। গল্প, উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতিতে যে সব বাছা-বাছা চীজ চুরি করার অপরাধে অপরাধিণী করা হয় (যেমন কি, মন চুরি প্রাণ চুরি ইত্যাদি) আমি সে সব চুরির কথা ব'লছিনে, কিন্তু মেয়েদের এই চুরি ক'রে আড়ি পেতে অন্যের কথা শোনা, চুরি ক'রে দেখা, চুরি ক'রে অন্যের পত্রটি বে-মালুম গাপ করে' নিদেন পক্ষে একবার পড়ে নেওয়া, এই চুরিগুলো যে ভদ্র-মহিলা ঝুটা ব'লে উড়িয়ে দেবেন, তিনি যে সত্য কথা ব'লছেন না, এ আমি যে কারুর মাথায় হাত দিয়ে ব'লতে পারি! এ-বিদ্যা যে আমাদের মজ্জাগত, জন্মগত। যাক্—

তোমার চিঠিতে যা সব লিখেছ, তা নিয়ে আর তোমায় লজ্জা রাঙা ক'রে তুলবো না। আমার পক্ষে ও আলোচনা অন্যায়, কেননা আমি নাকি তোমার মহামাননীয়া ভাবী সাহেবা, পূজনীয়া শিক্ষয়িত্রী অর্থাৎ একাধারে দু-দুটো আদব-কায়েদা দাবী-দাওয়া-কারিণী। তোমাদের মত এ-রকম বিশ্রী হ'লেও কই আমি ত তোদের কখনো এ-রকম বিশ্রী শিক্ষা দিইনি। আমি ভাল-বাসতে স্নেহ দিতে শিখিয়েচি, কিন্তু ভয় ক'রে ভক্তি কর, জানি না। যদি কোন দিন ও-রকম পাঠশালের ছেলের গুরুমশাইতে ভক্তি করার মত আমাকে ভয়-ভক্তি ক'রে থাক, তবে এখন থেকে আর তা করো না! এটুকু না লিখে পারলাম না ব'লে তুমি যেন কষ্ট পেয়ো না।

তোমার দুঃখ কষ্টের কথাগুলি আমার বুকে তীরের ফলার মত এসে বিঁধেছে। তুমি কি বুঝবে মাহ্‌বুবা আমি যখন এখানে আসি তুমি তখন ছিলে পাড়াগাঁয়ের সাদাসিদে অশিক্ষিতা সরলা বালিকা, আমিই যে তোমায় এত কষ্ট করে এতদিন ধ'রে মনের মতটী ক'রে গ'ড়ে তুলেছি। তোমাদের লেখা-পড়া শিখিয়ে আমার নববধূ কালটা বড্ড আনন্দেই কেটে গিয়েছি। শেফিটা বড় দুষ্ট, সে ত আর তেমন শিখতে পারলে না, কিন্তু তোমার ঐ বিদ্রোহ অভিমান মাধুর্যের সাথে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ আমায় তোমাকে একটু বেশী ক'রেই ভালবাসতে বাধ্য ক'রেছিল। তার পর যখন শুনলাম তুমি আমাদেরই ঘরের বৌ হ'য়ে থাক্‌বে, তখন সে কি যে আনন্দে আর গর্ব্বে আমার প্রাণ শতধারে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল' সে বললে তুমি হয় ত বাড়াবাড়িই মনে ক'রবে। আগে যখনই মনে হোত, আমার পোষা পাখী তুমি হয়ত অন্য কার সোনার খাঁচায় বন্দিনী হ'য়ে কোন দূর দেশে চ'লে যাবে, তখন একটা হিংসুটে বেদনায় যেন আমি বড্ডো অসুস্থতা অনুভব করতাম। এ ভাবটা কিন্তু আমার মনে জেগেছিল নূরুল হুদা আমাদের বাড়ী আসবার পর থেকে। তোমাদের দুজনকে দেখলেই আমার মনে মধুর একটা আকাঙ্ক্ষা রঙীন হয়ে দেখা দিত, কিন্তু নূরুর খামখেয়ালীর ভয়ে আর বনের পাখী পাছে আবার বনে উড়ে যায় এই শঙ্কায় আমি কোন দিনই এ কথাটা পাড়তে সাহস করিনি। আমার এ মন গুমরানী শেষে যখন অসহ্য হয়ে দাঁড়ালো, তখন সবাইকে বলে কয়ে বুঝিয়ে এক রকম এক ক'রলাম, কিন্তু বনের পাখী পোষ মেনেও মানলে না। সে চ'লে গেল! মিঠা আর আঠা এই দুটোর লোভকেও সে সামলাতে পারছিল না, কিন্তু শেষে ডানা কাটার ভয়টাই তার হয়ে উঠলো সবচেয়ে বেশী, তাই সে উড়ে গেল! আমার এই অতিরিক্ত স্নেহের বাড়াবাড়ির জন্যে আজ আমার যা কষ্ট তা এক আল্লাই জানেন বোন, আর আমিই জানি' এক এক দিন সব কথা আমার মনে হয় আর বুক ফেটে পড়বার মতন হয়ে যায়। তোদের দুজনের কাকে যে বেশী স্নেহ করতাম, তা কোনদিন আমি নিজেই বুঝতে পারতাম না, তাই তোরা দুটিতেই আমার চোখের সামনে থাকবি, আমোদ-আহলাদ করবি আর আমারও দেখে জান ঠাণ্ডা হবে, চোখ জুড়াবে ভেবেই এমন কাজ করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু হয়ে গেল আর এক! এই যে মধ্যে গোলমাল হয়ে এত বড় একটা তাল পাকিয়ে গেল এতেও আমি কিন্তু হাল ছাড়িনি, আমার যেন আশা হচ্ছে খোদা তোদের দুহাত এক করবেন।—কিন্তু এইখানে একটা মস্ত কথা মনে পড়ে গেল ভাই, সত্যি কথা বলবি বোন আমায়? নূরু পল্টনে চলে যাবার কয়েক দিন আগে থেকে তোকে যেন কেমন মন মরা দেখাচ্ছিল,—কি যেন চাপা ব্যথা তোর

দেখে কাজে কথায় অলস ম্লান হয়ে তোকে মুষড়ে দিচ্ছিল,—আচ্ছা আমার এ ধারণাটা সত্যি নয় কি ? আজ এত দিনে এ কথাটা বলছি, তার কারণ তখন আহলাদের আবেশে ওটা আমি দেখেও দেখিনি। দেখলে ভুল মনে হয়েছিল যে বিয়ের আগে জোয়ান মেয়ের ও রকম হওয়াটা বিচিত্র নয়। তাই তখন যেন তোর ও মলিন মূর্ত্তি দেখেও বেশ আলাদা রকমের একটা সুখ অনুভব করতাম ! মানুষ কাছে থাকলে তাকে ঠিক বুঝে উঠবার অবসর হয়ে ওঠে না, তার নানান কাজ' নানান হাব ভাব কথা বার্ত্তা ইত্যাদি বাইরের জিনিসগুলোই, মনকে এমন ভুলিয়ে রাখে যে সে তার ভিতরকার কাজ অন্তরের আসল মূর্ত্তিটার কথা একেবারেই ভেবে দেখতে পায় না। তারপর সে যখন চলে যায়, তখন তারই ঐ কাজের সমস্ত খুঁটিনাটিগুলি অবসর চিন্তায় এসে বাধা দেয় আর তখন একে একে বদ্ধফুলের হঠাৎ পাপড়ি খোলার মতন তার অন্ধদৃষ্টিও ও যেন খুলে যেতে থাকে এবং ক্রমেই সে তার অন্তরের অন্তরতম ভাবগুলিকেই যেন বুঝতে পারে। তাই আজ তোরা দুজনেই যখন আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলি তখনই বুঝলাম রে, না:, তোদের দুজনেরই মাঝে কি যেন কেউ দেখতে পাচ্ছিনে। কি সে ব্যবধান ? কি হয়েছিল তোদের ? বলবি বোন আমায় ? বলবি ভাই আমায় ?

জানি না বোন, তোদের এই বেহেশ্‌তের ফুল দুটির পবিত্র ভালবাসায় কার অভিশাপ ছিল। তোরা যে উভয় উভয়কে হৃদয়ের নিভৃততম মহান আসনে বসিয়ে বুকের সমস্ত ঐশ্বর্য্য দিয়ে অর্ঘ্য বিনিময় করতিস, তা আমার চক্ষু কোন দিনই এড়ায়নি। তোরা হাজার ছল-ছুতো অমিলা ক'রে খুব মস্ত মাথা নাড়া দিয়ে "না—না" বললে—ওরে, তোদের প্রাণের ভাষা যে চোখে-মুখে লাল অক্ষরের লেখা হ'য়ে ধরা পড়তো ? পুরুষদের কথা ব'লতে পারিনে, কিন্তু এ জিনিসগুলো মেয়েদের চোখ এড়ায় না, তা তারা যতই উদাসীন ভাসা-ভাসা ভাব দেখাক। তার কারণ বোধ হয়, এ দিক দিয়ে অধিকাংশ মেয়েই ভুক্তভোগী ! তা ছাড়া, মেয়েদের আবার মন নিয়েই বেশীর ভাগ কারবার। স্নেহ-ভালবাসা— সোহাগ-যত্ন রাতদিন তাদের ঘিরে র'য়েছে, তাদের বুকের ভেতর ঝর্ণাধারার মত নানান দিকে পথ কেটে বিচিত্র গতিতে ব'য়ে চ'লেছে আর সহস্র ধারায় বিলিয়েও এ অফুরন্ত স্নেহ দরদ তাদের এতটুকু কমেনি। সে-কোন অনন্ত স্নেহময়ী মহানারীর স্নেহ-প্রপাত যেন নির্ঝর-ধারার উৎস ! আমার মা বোন স্ত্রী কন্যা বড় হ'য়ে সংসার মরুর আতপতপ্ত পুরুষ-পথিকের পথে মরুদ্যান রচনা ক'রেছি, তাদের গদ্যময় জীবনকে স্নেহ-কবিতা সৌন্দর্য-মাধুর্য্যে

মণ্ডিত করে তুলছি, তাদের অনিয়ন্ত্রিতজীবন-যাত্রাকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে দিচ্ছি—ভালবাসা দিয়ে সব গ্লানি সব ক্লান্তি সব নৈরাশ্য দৈন্য আলাই-বালাই মুছে নিচ্ছি,—আমাদের কাছে তাই ফাঁকি চলে না ! আমরা সব-জান্তার জা'ত !... তাই, আমি তোদের এই চোরের মত সন্ত্রস্তভাব দেখে (আর, বড় লজ্জার কথা, সেই সঙ্গে তোর বেহায়া ভাইজিও) মুখ টিপে হাসতাম ! মানব-প্রাণের এই যে বাবা-আদমের কাল থেকে সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রাণের প্রতি মানুষের টান, প্রাণের টান, গোপন পূজা—একে মানুষ কখনো ঘৃণা করতে পারে না অবশ্য নীচ মন লোকেদের কথা ব'লছি না। তাই তোদের দু'জনারই মধ্যে ঐ যে একটা মজার টানা-হেঁচড়ার ভাব, লাজ-অরুণ সঙ্কোচ আর সব চেয়ে ঐ ঘটি-বাটি-চুরি করা ছেঁচ্‌কি চোরের মত "এই বুঝি কেউ দেখে ফেললেরে—এই ধরা প'ড়লাম রে"-ভাব আমাদের যে কি আনন্দ দিত, তা ঠিক বোঝানো যায় না। বিপুল একটা তৃপ্তির গভীর স্বস্তিতে আমাদের দু'জনারই বুক ভ'রে উঠতো। তোর সদানন্দ ভাইটির তো দু'-এক দিন চোখ ছলছ্‌ল ক'রে উঠতো। আর পাছে আমার কাছে ধরা পড়ে অপ্রতিভ হ'য়ে যান, তাই তাড়াতাড়ি "ধ্যেৎ, চোখে কি ছাই প'ড়ে গেল" ব'লে চোখ দুটো কচলাতে থাকতেন, নয় ত এসরাজটা নিয়ে সুর বাঁধায় গভীর মনোনিবেশ ক'রতেন। আহা খাপ্‌ছাড়া আশ্বিনের এক টুকরো শুভ্র সজল চপল মেঘের মত নূরু, যা কভু জ'মে শক্ত তুহিন হ'য়ে যায় আবার গ'লে ঝরে পড়ে যেন শান্ত বৃষ্টিধারা,—মান্দার-পারিজাতের চেয়েও কোমল, পাহাড়-ছোটা ঝর্ণা-মুখের চেয়েও মুখর শিশুর চেয়েও সরল হাসিভরা, পবিত্রতা-ভরা প্রাণ, স্নেহ-হারা বাঁধন-হারা নূরু,—সে আবার সংসারী হবে, তোর কিরণ-ছটায় তার সজল মেঘলা জীবনে ইন্দ্রধনুর সুষমা মহিমা আঁকা যাবে,—ওঃ, সে কি দৃশ্য ! বেহেশ্‌তে হুর গেলেমান বা স্বর্গে অপসরী কিন্নরী ব'লে কোন প্রাণী থাকলে এখোশ-খবরের "মোজ্‌দা" তারা স্বর্গের দ্বারে দ্বারে বিলিয়ে এসেছিল, মেওয়া-মিষ্টির খাঞ্চা ঘরে ঘরে ভেট দিয়েছিল !

আমরা তোদের এই পূর্ব্বরাগকে কেন প্রশ্রয় দিতাম জানিস্ ? হাজার অন্দরমহলের আড়াল আবডালে ছাপা থাকলেও আমাদের অনেকের জীবনেই এমন একটা দিন-ক্ষণ আসে যখন একজনকে দেখেই প্রাণের নিভৃত পুরে অনুরাগের গোলাবী-ছোপের দাগ লেগে যায়। এ অনুরাগ আবার অনেক সময় ভালবাসাতেও পরিণত হতে দেখা যায়, আর সেটা কিছুই বিচিত্র নয়। অবশ্য তা কারুর হয়ত সফল হয়, কারুর বা সে আশা মুকুলে ঝরে পড়ে, আবার

কেউ হয় ত সাপের মাণিকের মতন মর্ম্মের মর্ম্মে তাকে আমরণ লুকিয়ে, রাখে,—তার অন্তর্যামী ভিন্ন অন্য কেউ ঘুণাক্ষরেও তা জানতে পারে না। আমার কথা তো জানিস। আমার বাবাজান্ যখন সাবজজ হ'য়ে বাঁকুড়ায় বদলি হ'লেন, তখন আমার বয়স পনের ষোলর বেশী না। তখনো আমি খুবড়ো। তাই মাজানের চাড়ে আমার সাদির জন্য বাবাজান একটু ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়লেন। আজকাল বাপ-মা'রা মহাজন-বিদায় বা ঘরের আবর্জ্জনা ঝেঁটিয়ে ফেলার মতই যেন মেয়েকে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতে চায়, ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়লেও আমাকে ও রকম অবহেলা হেনেস্তা সইতে হয়নি। বড্ডো আদরেই মানুষ হয়েছিলাম বোন, বাপের একটি মেয়ে,—বাবাজান ত আমায় 'আম্মাজান' 'আম্মাজান' ক'রে আদর-সোহাগ দিয়ে হয়রান ক'রে ফেললেন। সবচেয়ে তাঁর বেশী ঝোঁক ছিল আমার লেখা-পড়া শেখবার দিকে। এর জন্য কত টাকা খরচ ক'রেছেন তার আর ইয়ত্তা নেই। আমার ঘরই ত একটি জবরদস্ত লাইব্রেরী ছিল, তার ওপর আবার এক ব্রাহ্ম শিক্ষয়িত্রী রেখে আনায় নানান বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। লোকে, বিশেষ ক'রে গোঁড়া হিন্দুরা, কেন যে ভাই ব্রাহ্মদের ঠাট্টা করে, আমি বুঝতে পারিনে। আমার বোধ হয় ও শুধু ঈর্ষা আর নীচমনার দরুণ। ভাল-মন্দ সব সমাজেই আছে, তাই বলে যে অন্যের বেলায় শুধু মন্দের দিকটাই দেখে ছোটলোকের মত টিটকারী মারতে হবে এর কোন মানে নেই। আমার পূজনীয়া শিক্ষয়িত্রী ব্রাহ্ম মহিলার কথা মনে প'ড়লে এখনো একটা বুক-ভরা পবিত্র ভক্তিতে আমার অন্তর যেন কানায় কানায় ভ'রে ওঠে। এত মহিমান্বিতা মাতৃ-শ্রী-মণ্ডিতা যে ধর্ম্মের নারী, এত অনবদ্য পূত শালীনতা ও সংযমবিশিষ্টা যে সমাজের নারী, সে ধর্ম্মকে সে সমাজকে আমি সালাম করি। আমি তাঁকে মায়ের মতই ভক্তি ক'রতে পেরেছিলাম, ভালবাসতে পেরেছিলাম, এমনি স্নেহ-মাধুর্য্যে পবিত্র স্নিগ্ধতায় ভরা ছিল তাঁর ব্যবহার! মা কত দিন এসে হেসে ব'লতেন,—"দিদি, তুমি আমার রেবাকে মা ভুলিয়ে দিলে দেখছি।" তিনিও হেসে ব'লতেন,—"এ বোন, আজকালকার মেয়েগুলোই নিমকহারাম, আজ তোমাকে ছেড়ে আমাকে মা ব'লছে, আবার দু'দিন বাদে শাশুড়ি গতরখাগীকে মা বলবে গিয়ে। আর তা ছাড়া আমার সাহসিকতাও তোমার নাম ক'রতে পাগল! সে আবার আফ্সোস করে যে, কেন তোমার পেটে সে জন্মায়নি। এখন এক কাজ করি এসো, আমরা মেয়ে বদল করি।" তুই বোধ হয় শুনেচিস যে, ওঁর সাহসিকা বলে আমারই বয়সী একটি মেয়ে ছিল। তাতে আমাতে এত গলায়-গলায় মিল ছিল, তা যদি শুনিস ত তুই অবাক হ'য়ে যাবি। আমার সে শিক্ষয়িত্রী-মা আজ আর নেই,— আজ এই কথাটি মনে হ'তেই দেখেছিস

টস্ টস্ ক'রে আমার চোখ দিয়ে জল বেয়ে পড়লো! সাহসিকা বি এ পাশ ক'রে এখন এক স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কাজ করছে। প্রথম জীবনেই সে বুকে মস্ত এক দাগা পেয়ে বিয়ে টিয়ে করেনি, চিরকুমারী থাকবে ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছে। সে এখনো মাঝে মাঝে আমায় চিঠি দেয়, সে চিঠিগুলোর এক একটা অক্ষর যেন বুক ফাটা কান্নার অশ্রু-ফোটা। তুই যদি আসিস তা হ'লে এবার সব চিঠিগুলো তোকে দেখাব। আঃ, সে কতদিন তাতে আমাতে দেখা নেই, তবু তার কথাটা যখনই মনে হয় তখনই যেন জানটা সাত পাক মোচড় খেয়ে উঠে। আমার বিয়ের সময় তার কি আমোদ, তাঁরা আমার বিয়েতে এসেছিল। আজ আমার মাও নেই তারও মা নেই, তাঁরা বোধ হয় বেহেশ্‌তে গিয়ে আবার এক সঙ্গে মিলেছেন, তাঁদের এই অভাগী মেয়েদের জন্যে সেখানেও জান খাঁ খাঁ করে কি না, কান্না পায় কি না, তা কে জানে? অন্য কোন জাতির কোন ধর্ম্মের কোন সমাজের নারীর মধ্যে কই নারীত্বের এমন পূর্ণ বিকাশ ত দেখিনি। এই সমাজের যত নারী দেখছি, সবারই ব্যবহার কথাবার্ত্তা এত সুন্দর আর মিষ্টি যে, তাতে বনের পাখীরও ভুলে যাবার কথা, এঁদের বুকে যেন স্নেহের ভরা গঙ্গা ব'য়ে যাচ্চে! যারা একে বাড়াবাড়ি বলে বা মানে না, উল্টো নিন্দা করে, তারা বিশ্বনিন্দুক আমার বোধ হয় এঁরাই এ দেশে সর্ব্বাগ্রে সামাজিক পারিবারিক যত অহেতুক খামখেয়ালীর বন্ধনকে কেটে স্বাধীন উচ্চশির নিয়ে মহিমময়ী রাণীর মত দাঁড়িয়েছেন বলেই দেশের অধীনতাপিষ্ট বন্ধন জর্জ্জরিত লোকের যত বুক-চড়্‌চড়ানী! এঁদের সঙ্গে যে খুব সহজ সরল স্বচ্ছন্দে প্রাণ খুলে মিশতে পারা যায়, এইটেই আমাকে আনন্দ দেয় সব চেয়ে বেশী। এঁদের মধ্যে ছোঁয়াচে রোগ বা ছুঁৎমার্গের ব্যামো নেই, কোন সঙ্কীর্ণতা, ধর্ম্ম-বিদ্বেষ, বেহুদা বিধি-বন্ধন নেই। আজ বিশ্ব-মানব যা চায়, সেই উদারতা সরলতা সমপ্রাণতা যেন এর বাইরে ভিতরে ওতপ্রোত-ভাবে জড়ানো র'য়েছে। আমরা বড় বড় হিন্দু পরিবারের সঙ্গেও মিশেছি, খুব বেশী ক'রেই মিশেছি এবং অনেক হিন্দু মেয়ের সঙ্গে খুব ভাবও হ'য়েছিল, কিন্তু এমন দিল-জান খোলসা ক'রে প্রাণ খুলে সেখানে মিশতে পারিনি। কোথায় যেন কি ব্যবধান থেকে অনবরত একটা অশোয়াস্তি কাঁটার মত বিঁধতে থাকে। আমরা তাঁদের বাড়ী গেলেই, তাঁরা হন আর না হন, আমরাই বেশী সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়ি,—এই বুঝি বা কোথায় কি ছোঁয়া গেল আর অমনি সেটা অপবিত্র হ'য়ে গেল! আমরা যেন কুকুর বেড়াল আর কি! তারাও আমাদের বাড়ী এসে পাঁচ ছয় হাত দূরে দূরে পা ফেলে ড্যাং পেড়ে পেড়ে আসেন, পাছে কোথায় কি অপাদা মাড়ান। এতে মানুষকে কত ছোট হ'য়ে যেতে হয়,

তার বুকে কত বেশী লাগে। এখনো দেশে পনর আনা হিন্দুর সামাজিকতা এই রকম আচার-বিচারে ভরা। যারা শহরে থেকে বাইরে খুব উদারতার ভান দেখান তাদের পুরুষরা যাই হন, মেয়েদের মধ্যে এখনো তেমনি ভান। ভিতরে এত অসমনঞ্জস্য ঘৃণা বিরক্তি চেপে রেখে বাইরে মুখের মিলন কি কখনো স্থায়ী হয়? এ মিথ্যা আমরা উভয়েই মনে মনে খুব বুঝি কিন্তু বাইরে প্রকাশ করিনে। পাশাপাশি থেকে এই যে আমাদের মধ্যে এত বড় ব্যবধান, গরমিল —এ কি কম দুঃখের কথা? আমাদের আত্মসম্মান আর অভিমান এতে দিন দিনই বেড়ে চলেছে। আমরা আর যাই হই, কিন্তু কেউ হাত বাড়িয়ে দিলে বুক বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করবার উদারতা আমাদের রক্তের সঙ্গে যেন মেশানো। তাই এই অবমাননার মধ্যে হঠাৎ এই ব্রাহ্ম সমাজের এত প্রীতিভরা ব্যবহার যেন এক-বুক অশোয়াস্তির মাঝে স্নিগ্ধ শান্ত স্পর্শের মত নিবিড় প্রশান্তি নিয়ে এসেছে। আমাদের ঘরের পাশের হিন্দু ভগিনীগণ যখন এমনি ক'রে মিশতে পারবেন, তখন একটা নতুন যুগ আসবে দেশে এ আমি জোর ক'রে বলতে পারি, এই ছোঁয়া ছুঁয়ির উপসর্গটা যদি কেউ হিন্দুসমাজ থেকে উঠিয়ে দিতে পারেন, তা হ'লেই হিন্দু মুসলমানের এক দিন মিল হ'য়ে যাবে। এইটেই সব চেয়ে মারাত্মক ব্যবধানের স্থষ্টি ক'রে রেখেছে, কিন্তু বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, হিন্দু-মুসলমানে মিলনাকাঙ্ক্ষী বড় বড় রথীরাও এটা ধ'রতে পারে নি। তাঁরা অন্য নানান দিক দিয়ে এই মিলনের চেষ্টা ক'রতে গিয়ে শুধু পণ্ডশ্রম ক'রে ম'রছেন। আসল রোগ যেখানে, সেখানটা দেখতে না পেয়ে কানা ডাক্তারের মতন এঁরা একেবারে মাথায় ষ্টেথিস্কোপ বসিয়ে গম্ভীরভাবে রোগ ও ওষুধ নির্ণয়ের চেষ্টা ক'রছেন। এই 'ছুঁৎমার্গ' দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে বের ক'রতে আমাদের হিন্দু মা বোনদেরই চেষ্টা ক'রতে হবে বেশী। কেন না পুরুষদের চেয়ে এঁদেরই এ বদ্ রোগটা ভয়ানক মজ্জাগত। আজ কাল অনেক হিন্দু ভদ্রলোক বিশেষ ক'রে নব্য সম্প্রদায় (যুবক প্রৌঢ় দুই) খুব প্রাণ খুলে একসঙ্গে আমাদের পুরুষদের সঙ্গে ব'সে আহার করেন, আলাপ করেন' এতটুকু ছোঁয়া যাবার ভয় নেই। কিন্তু আমাদের হিন্দু ভগিনীরা হাজার শিক্ষিতা হ'লেও অমনটি পারেন না। এটা তাদের ধর্ম্মের অঙ্গ কি না জানি না, কিন্তু আমার বোধ হয় দুনিয়ার কোন ধর্ম্মই এত অনুদার হতে পারে না, এ নিশ্চয়ই সমাজের স্থষ্টি! দেশকালপাত্র ভেদে সমাজের সংস্কার হওয়া উচিত নয় কি?

হায় কপাল! দেখেছিস, কি লিখতে গিয়ে কি সব বাজে ব'কলাম! আমি এতখন ভুলেই গিয়েছিলাম যে তোকে চিঠি লিখছি। এ কথাগুলো লিখবার সময় আমার মনে হ'চ্ছিল যে আমি সাময়িকাকে চিঠি লিখচি, কারণ তাতে

আমাতে এই মত আলোচনাই হ'ত বেশী। যাক্ যা লেখা হ'য়ে গেল ঝোঁকের মাথায় তাকে অনর্থক ছিঁড়ে ফেলেই বা কি হবে? ভাল লাগে ত পড়িস, নয় ত ও জায়গাটুকু বাদ দিয়েই পড়িস। এখন আমার সেই হারানো কাহিনীটা আবার 'বিসমিল্লাহ্' ব'লে শুরু করি :—

হাঁ, তারপর এক সেই সময় কি সব জমিদারী ব্যাপার নিয়ে, না কি জন্যে আমার শ্বশুর সাহেব মর্‌হুম তখন বাঁকুড়াতেই সপরিবারে বাস ক'রছিলেন। আর তোমার এই গুণধর ভাইজী বাঁকুড়ার কলেজে পড়ছিলেন। আমাদের বাসা এক রকম কাছাকাছিই ছিল, কাজেই অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে এঁদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে যায়, আর তখনি আমার বিয়ের কথা ওঠে। আমাদের 'ইনি' (বর্ত্তমানে 'খুকীর বাপ') অর্থাৎ তোমার ভাইজী তখন কি জানি কেন আমাদের বাড়ী ঘন ঘন যাওয়া-আসা ক'রতে লাগলেন। ওঁর নানা অছিলা ক'রে হাজারবার আমাদের বাড়ী আসা আর একবার আড়চোখে মাথা চুলকাতে চুলকাতে ফস্ ক'রে চারিদিকে চেয়ে নেওয়া দেখে আমার খুব হাসিও পেত, আবার বেশ মজাও লাগত। তিনি এক আধ দিন বিশেষ কাজে আসতে না পারলে ক্রমে আমার মনটা যেন কেমন উড়ু উড়ু উদাসীন ভাব বোধ হ'ত। দুষ্টু সাহসিকা তো এই নিয়ে আমায় গান শুনিয়ে টিপ্‌নি কেটে একেবারে অস্থির জ্বালাতন ক'রে ফেলতো! অবশ্য তখনো আমাদের দেখাশোনা হয়নি, আমাদের বললে ভুল হ'বে কেননা আমি নানান রকমে তাঁকে দেখে নিতাম, কিন্তু পুরুষদের দুর্ভাগ্যই এই যে কোন সুন্দর মুখ আড়াল থেকে তাকে দেখচে কিনা বেচারা ঘুণাক্ষরেও তা জানতে পারে না। সাহসিকা দু'—এক দিন দুষ্টমী ক'রে আমার ঘরে বেশ একটু জোর গলায়, যাতে উনি শুনতে পান, গান জুড়ে দিত—

"সখি, প্রতি দিন হায় এসে ফিরে যায় কে?
তারে আমার একটি কুসুম দে।"

তখন যদি তোমার এই শান্তশিষ্ট ভাইটির ছট্‌ফটানি দেখ্‌তে! আল্লাহ্! 'হাঁ করে তাকিয়ে এ-দিক ও-দিক দেখ্‌ছেন, কখনো বা গভীর মনোনিবেশ সহকারে চুপ ক'রে ব'সে গম্ভীর হ'য়ে প'ড়েছেন আবার কখনো বা কবির মত মাথার চুলগুলো খামচে ধরে মস্ত লম্বা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছেন! আমরা তো দু সই-এ হাসতে হাসতে গড়াগড়ি দিয়ে লুটিয়ে পড়তাম! বাবা, এত বেহায়াও হয় পুরুষে? ছিঃ মা! এখন তোমার ভাইজীকে সে কথা ব'ললে তিনি ব'লেন যে গানটা বড্ডো বেসুরো শুনাতো বলে, তিনি ও রকম ক'রে

অসন্তোষ প্রকাশ করতেন! হায় আল্লাহ! এত মিথ্যাবাদীও হয় মানুষে! আজ কাল আমাদের অনেক মিঞা-সাহেবই জোর গলায় ব'লছেন, অনেকে আবার লিখেও জানাচ্ছেন যে, আমাদের এ হেরেমের পাঁচিল পেরিয়ে পূর্ব্বরাগ এ জানালা-বন্ধ-ঘরে ঢুকতেই পারে না। হায় রে অন্ধ পুরুষের দল এঁরা ঠিক যেন চোখে ঠুলি পরা কলুর ঘানির বলদ। এঁরা খালি সামনেটাই দেখতে পান আশে-পাশের খবর একদম রাখেন না! এঁদের এই দৃষ্টিহীনতা দেখে আমার মত অনেকেই লুকিয়ে হাসে। আমি এদের লক্ষ্য ক'রে জোর গলায় ব'লতে পারি—'ওগো কাণা বলদের দল! বিয়ের আগেও হেরেমের বা অসূর্য্যম্পশ্যা মেয়েদের মনে পূর্ব্বরাগের সৃষ্টি হওয়াটা কিছুই বিচিত্র নয়! তোমরা তো আর জোয়ান মেয়ের বা যুবক ছোকরার মন বোঝ না, সোজা খাও দাও আর উপর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে তারা গোনো। তবে তোমাদের ভাগ্যি বলতে হবে যে অনেক পোড়ারমুখীরই এই পূর্ব্বরাগটা অধিকাংশ সময় অঙ্কুরেই বিনষ্ঠ হয়ে যায়, নৈলে এমনি একটা কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি হোত যে, পুরুষরা এ-কথার ঠিক উল্টোই বলতেন! কত অভাগীর মনে যে অঙ্কুর আবার মহীরূপে পরিণত হয়ে ওঠে, আবার কত জনা যে মনের বেদন মনেই চেপে তুষের আগুনের মতন ধিকি ধিকি ক'রে পুড়ে ছাই হয়, কে তায় খবর রাখে? কে তা জানতে চায়? জানলেও কার বুকে তার বেদন বাজে? একটা কাচের বাসন ভাঙলেও লোকে 'আহা' করে, কিন্তু বুক ভাঙলে, হৃদয় ভাঙলে, জেনেও কেউ জানতে চায় না, 'আহা উহু' করা ত দূরের কথা। কিন্তু কোন মুখপুড়ী যদি কূলে কালি দিয়ে ভেসে যায়, তখন এদের আস্ফালনে গগন বিদীর্ণ হয়ে যায়। পুরুষরা এত সুবিধে ক'রে উঠতে পেরেছেন, তার কারণ মেয়েদের মুখ থাকতে বোবা, বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না!—এই নে, ফের কোথায় সরে পড়েছি।—

তার পর বোন, সত্যি বলতে কি, তোর এই সোজা মানুষ ভাইটীকে ক্রমেই আমার বেশ ভাল লাগতে লাগলো। বিশেষ করে ওঁর কণ্ঠ ভরা গান আমার কানে বড্ডো মিষ্টি শুনাত। পরে জেনেছি, এই ভাল লাগাটাই হচ্চে পূর্ব্বারাগ। এখন মনে হয় পুরোপুরি ভালব্যাসার চেয়ে এই পূর্ব্বারাগের গোলাবী রাগটরই মাদকতা আর মাধুর্য্য বেশী, এর পাৎলা অরুণ ছোপ বুকে নিবিড় হয়ে না লাগলেও এর তখনকার রঙটা বেশ চমৎকার। যদিও আমি থাকতাম অন্তঃপুরের অন্তরতম কোন কোণে অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে, তবুও ওঁর পায়ের ভাষা আমি অতি সহজেই বুঝে ফেলতাম। রোজ সন্ধ্যা হবার অনেক আগে থেকেই তাঁর গান শোনবার জন্যে আমি উৎকর্ণ হয়ে থাকতাম,—কেননা তিনি মনুকে গান শিখানোর অছিলাতেই অন্য সময় ছাড়া সন্ধ্যেটাতে রোজ আসতেন আর

শেখানোর চেয়ে নিজে গাওয়াটাই বেশী পছন্দ করতেন ; কেননা নিশ্চয়ই তাঁর এ আশা থাক্‌তো যে একটী তরুণ প্রাণী লুকিয়ে থেকে তাঁর গান শুনছে !... আমার এই উনমনা ভাবটা অন্ততঃ মায়ের চক্ষু এড়ায়নি, এটাও আমি বুঝতে পারতাম। এইখানে আর একটা কথা ব'লে রাখা আবশ্যক,—আমাদের পূর্ব্বরাগটা এক তরফা হয়নি অর্থাৎ শুধু আমিই নয়, তোমার ভাইজীকেও নাকি ঐ একই রোগটায় বেশ একটু বেগ পেতে হ'য়েছিল। কেন না আমাদের বিয়ে হবার পর এই সত্যবাদী ভদ্রলোক মুক্তকণ্ঠে আমার কাছে স্বীকার ক'রেছিলেন যে, কোনো এক গোধুলি-লগ্নে সদ্য স্নাতা আলুলায়িতা-কেশ আমায় তিনি আমাদের মুক্ত বাতায়নে উদাস আনমনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন তা ছাড়া আরো দু' একদিন—কোনদিন বা আঁচলের প্রান্ত, কোন দিন বা চুলের একটি গোছা, কোন দিন বা ঈষৎ আবছা চোখের চাওয়ায়, অভাবে কোন দিন বা চাবির রিং-এর বা রেশ্‌মী চুড়ির রিণিঝিণি—এই রকম যত সব ছোটো খাটো পাওয়ার আনন্দেই তিনি একেবারে রাশি রাশি ভাঙা হৃদয় মাঝারে, তাঁর হৃদয় হারিয়ে ফেলেছিলেন ! তা না হ'লে তিনি এতদূর নিঃস্বার্থ পরোপকারী হ'য়ে ওঠেননি যে, পরের বাড়ী গিয়ে এতবার এতক্ষণ ধ'রে ধন্না দিয়ে আসেন। তাঁর অবস্থা নাকি আবার আমার চেয়েও শোচনীয় হ'য়ে প'ড়েছিল এই বিরহ-ভোগের ঠেলায়, আর তাঁরই প্রমাণ স্বরূপ এমন ভাল ছেলে হ'য়েও সেবার তিনি বি-এ ফেল ক'রলেন। অগ্রেই সত্যিকার বিয়ে পাশ ক'রে ফেলার দরুনেই নাকি তিনি সেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ টা পাশ করতে
ফেলার দরুনেই নাকি তিনি সেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ টা পাশ করতে
পারেন নি। সাহসিকতাই এই কথাটা ও'কে লিখে জানিয়েছি, সে আরো লিখেছিল যে, আপাতত বিশ্ববিদ্যালয়ে ডবল "অনার্স" উঠে গিয়েছে কিনা, তাই "বিয়ে" অনার্সের পর আর একটা অনার্স মঞ্জুর হল না !—এইখানে আমার কথাটি ফুরালো নটে গাছটি মুড়ালো। আমাদের অনেক ঘরের কথা তোকে জানিয়ে দিলাম এই জন্যে যে তোর উপন্যাস আর গল্প পড়ার ভয়ানক সখ। আর এটা নিশ্চয় জানিস যে, গল্প উপন্যাস সব মনগড়া কথা, তাই আমাদের এই সত্যিকার ঘটনাটা তোকে উপন্যাসের চেয়েও হয়ত বেশী আনন্দ দেবে। এতে আমার লজ্জার কিছুই নেই। আর এ-রকম ক'রে বলা বা লেখাও মেয়েদের পক্ষে কিছুই কঠিন নয়। মেয়েরা যা একটু লজ্জাশীলা থাকে বিয়ের আগেই তারপর বিয়ে হয়ে গেলেই (তাতে যদি ছেলের মা হ'ল ত কথাই নেই) তাদের সাম্‌নে দিকটার এক হাত ঘোমটা পিছন দিকে দু'হাত ঝুলে পড়ে। তা ছাড়া, এ আমাদের ননদ-ভাজের ঘরোয়া গোপন চিঠি, এ ত আর অন্য কেউ দেখতে আসছে না।...

এইবার অন্যান্য দরকারী কথা কটা ব'লে ফেলি। তিন দিন থেকে একটু একটু ক'রে বতই চিঠিটা লিখছি, কথা যতই বেড়েই চ'লেছে দেখছি।

তুই বোধ হয় শুনেছিস যে, তোর সই শোফিয়ার বিয়ে! কিন্তু তোর চিঠিতে ও কোন উল্লেখ না দেখে বোঝাও ত যায় না যে তুই এ-খবর জানিস! আর জানবিই বা কি ক'রে বোন? আমি নিজেই জানতাম না এতদিন। তোমার এই সোজা শেওড়া গাছ ভাইনী ত কম নন, "নিগু মুখো ষষ্টি, ছেলে খান দশটা।" এ মহাশয় লোকটির কুটে কুটে বুদ্ধি। তিনি তলে তলে এ সব মতলব পাকিয়ে "চুনি বিল্লি"র মত চুপসে ব'সেছিলেন, অথচ ঘরের কাউকে এমন কি এ-বান্দাকে এখনো এতটুকু ইসারায়ও জানতে দেননি।—একদিন গম্ভীরভাবে এসে বললেন কি,—"ছেলেটি দেখতে শুনতে বেশ, এবছর বি-এ দেবে, স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধেও জোর "সার্টিফিকেট" পাওয়া গেছে, তার সম্বন্ধে কোন খটকা নেই আর যা' দু'-একটু দোষ-ঘাট আছে তা তেমন নয়—নিষ্কলঙ্ক চাঁদই বা আর কোথায় পাওয়া যাবে!" ইত্যাদি। আমি তো বোন প্রথমে ভেবেই পাইনে উনি কি ব'লছেন। পরে মনে করলাম, হতেও পারে। পরে কত "নখরা তিল্লা" করে বলা হ'ল যে, আমাদের মনুষয়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ তিনি অনেকদিন থেকে মনে এঁটে রেখেছেন। আমাকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যেই এত দিন তা বলা হয়নি।...সে যাই হোক, এইবার কিন্তু দুই বাঁদর-বাঁদরী মিলবে ভাল। মনুটা যেমন বাঁদর বেলেল্লা, শোফিও তেমনি আফলাতুন কাহারবা মেয়ে! ঝাঁটার চোটে বিষ নামিয়ে দেবে সে! বিয়ের পরেই ওদের যদি রোজ হাতাহাতি না হয়, তো আমার নাম আর কিছু রাখিস! ..এইখানে আর একটা কথা,—এ বিয়ের কথাবার্ত্তা হবার পর থেকেই শোফি যেন কেমন গুম হ'য়ে গিয়েছে! সামনা-সামনি হলে কেমন যেন একটা টেনে-আনা হাসির আভা সে তার গম্ভীর মুখে ফুটিয়ে তুলতে চায়, কিন্তু ব্যর্থ হ'য়ে সেটা সকলের আগে তারই কাছে ধরা পড়ে যায়, আর সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরটাতে গিয়ে শুয়ে পড়ে। তার চোখের নীচে প্রচ্ছন্ন বেদনার একটা স্পষ্ট দাগ যেন দিন দিন কালো হয়ে ফুটে উঠ্ছে! আমি ত হয়রান হয়ে গেছি বোন ওকে জিগ্‌গেস ক'রে ক'রে। সে শুধু হেসেই আমার কথা উড়িয়ে দেয়, আবার দু'-একবার বেশী জিগ্‌গেস্ ক'রলে রাগের চোটে ঠোঁট ফুলিয়ে আমার পায়ে মাথা কুটে মরে, নয় ত নিজের চুল-গুলোকে নিজে নিজেই ছিঁড়ে পাড়িপাড়ি ক'রে ফেলে। তার চিল্লানী শুনে' আর 'তিখানি' দেখে বোন এখন আমার তার কাছে যেতেও ভয় হয়। মাগো মা! এমন 'টিট' মেয়ে আমি আর কখনো দেখিনি। ওর এরকম গতিক দেখে

তোমার ভাইজীও যেন কেমন ক্ষুণ্ন শঙ্কিত হ'য়ে পড়েছেন, অথচ যার ব্যথা তার কোথায় যে কি ব্যথা, তা বুঝবার কোনই উপায় নাই। আমি নাচার হ'য়ে এখন হা'ল ছেড়ে দিয়েছি। আমার মতন মাঝি যার মন-দরিয়ার কূল-কিনারা পেলে না, সে সহজ পাত্তর নয়! ওর মতলবটা কি বা কেন যে সে অমন ক'রছে তুই কি কিছু জানিস রে? তোতে ওতে মাণিক জোড়ের মতন দিন রাত্তির এক জায়গায় থাকতিস, কিনা, তাই শুধোচ্ছি, যদি তুই ওর মন-দরিয়ায় কোন মণি-মুক্তার খবর রাখিস। তোর মতন কাঁচা ডুবুরী যে কিছু তুলতে পারবে, তার আশা নেই, তাই দেখিস মাঝে থেকে যেন কাদা ঘেঁটে জলটাকে ঘোলা ক'রে দিসনে। আমি যে এখন কোন দিক দেখি ছাই, তা আর ভেবে পাচ্ছিনে। এত ঝঞ্ঝাট, বাবাঃ! যা হোক, তুই এখানে এলে যেন একটু-তবু নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে পারব মনে ক'রেছি! হাজার দিককার হাজার জঞ্জাল-ঝক্কির মাঝে পড়ে জানটা যেন বেরিয়ে যাবার মতই হ'য়েছে! শীগগির তোর ভাইজী যাবেন তোদের আনতে। এই ক'দিন তোদের না দেখে মনে হচ্ছে যেন কত যুগ দেখিনি! দেখিস অভিমান ক'রে আবার যাব না' ব'লে বায়না ধরিসনে যেন।

তোর জন্যে চিন্তা করিনে, তুই কেন তোর ঘাড় আসবে, না এলে ধ'রে পালকীতে পুরবো, ব'লবো এ আমাদের ঘরের বৌ, এর বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে নুরুর সাথে! ভয় যত তোর আম্মাজানকে নিয়ে! তাঁকেও মা চিঠি দিলেন। তিনি কিছু আপত্তি ক'রলে আমরা সবাই গিয়ে পায়ে ধ'রে তাঁকে নিয়ে আসবো। ...খুকী তো তোর আসবার কথা শুনে এই দু'দিন ধরে ঘণ্টায় হাজার বার ক'রে শুধাচ্ছে;—"মা লাল ফুপু কখন আসবে!" কত রকম কৈফিয়ৎ দিয়ে তাকে ফুসলিয়ে রাখতে হয়, নৈলে সে কেঁদে চেঁচিয়ে চিল্লিয়ে বাড়ী মাথায় করে ফেলে। তাকে তোর যে-রকম ন্যাওটা করে ফেলেচিস, তাতে এখন তাকে যে ভুলিয়ে রাখা দায়। একটা কিছু হলেই "লাল ফুপু গো" ব'লে ডাক ছেড়ে কাঁদা হয়! মেয়েটা এমন নিমকহারাম, মা'কে ছেড়ে তোকেই এত ক'রে চিনলে। এখন তোর মেয়ে তুই সামলে রাখ ভাই এসে। নয় ত সাথে ক'রে নিয়ে যা। এই দু' মাসেই মেয়েটা যেন শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গিয়েছে!...

সেখানে আর যতদিন থাকিস, একটু সংযত হ'য়ে থাকিস বোন! কি করবি পরের বাড়ী দুটো মুখনাড়া সইতেই হবে।

তোর কথামত গত মাসের সমস্ত মাসিক পত্রিকাগুলি পাঠিয়ে দিলাম। দেখবি, আমাদের মেয়েরাও এবারে বাঙলা লিখছেন, যা আমি কোন দিন স্বপ্নে ভাবতে পারিনি।...

খালাজির পাক কদমানে হাজার হাজার আদাব দিবি। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষিণী—তোর ভাবি জান

রাবেয়া

(ঙ)

সালার
১৩ই ফাল্গুন

বোন্ আয়েশা !

তুমি আমার হাজার হাজার 'দোয়া' জানবে। মা মাহ্বুবাকে আমার বুকভরা স্নেহাশীষ দেবে। এখানে খোদার ফজলে সব ভালো। শোফিয়া আর বহুবিবি মা-জানের কাছে তোমাদের সব খবর জানতে পারলাম ; আমায় চিঠি দেবে ব'লে গিয়েছিলে, তা বোধ হয় বাপের বাড়ী গিয়ে ভুলেই গিয়েছ। ...আমি যেন আভাসে বুঝতে পারছি, তোমাদের সেখানে অনেক অসুবিধা ভোগ ক'রতে হচ্চে। তোমার না হলেও আমার মাহ্বুবা মায়ের যে খুবই কষ্ট হচ্ছে, একথা কে যেন আমার পোড়া মনে সারাক্ষণেই উসকে দিচ্ছে। আহা, খোদা তোমাদের সহি সালামতে রাখুন বোন ! আমার মাহ্বুবা মায়ের আলাই বালাই নিয়ে মরি ! এই ক'দিন মেয়েটাকে না দেখে আমার জান যে কিরকম ছট্‌ফট্ করেছে, তা তুমিও তো মেয়ের মা, সহজেই বুঝতে পারো ! মা-আমার সেই যে কাঁদতে কাঁদতে আমার পা ছুঁয়ে সালাম ক'রে বিদায় নিলে অথচ একটা কথাও বলতে পারলে না, তাই আমার দিনে রাতে হাজার বার ক'রে মনে হচ্ছে ! শোফি আরও দুইজনে মিলে ঘরটাকে যেন মেছো হাট করে রাখতো, ওর যাবার পর থেকে শোফিটা মন মরা হয়ে শুধু নিজের ঘরটাতে পড়ে থাকে, আর কিছু শুধোলে আমার কোলের ভেতর মুখ গুঁজে কাঁদে। সে কি ডুক্‌রে ডুক্‌রে কান্না বোন ওর, দেখে চোখের পানি সামলানো

দায় ! মা আমার যেন দিন দিন শিকড়-কাটা লতার মতন নেতিয়ে প'ড়ছে। কি হ'ল ওর, ওই' জানে আর ওই খোদাই জানে ! হাজার শুধোলেও কোন কিছু ব'লছে না। এমন চাপা মন তো ওর কোন কালে ছিল না বোন। আমার এত ভয় হ'চ্চে ! কা'ল দিন বাদে ওর বিয়ে, আর এখন থেকেই কিনা এমন হ'য়ে শুকিয়ে প'ড়ছে। হায়, আমি যে কি ক'রবো কিছুই ভেবে পাচ্ছিনা ! মাহ্বুবাটা থাকলেও বোধ হয় ও এমন হোত না। যাক্-খোদা যা লিখছেন অদৃষ্টে তাই হবে, আর ভেবে কি ফল !

তার ওপর আবার তোমাদের এই কাণ্ড ! তোমাদের এতটুকু কষ্টের কথা ভাবতেও যে আমি মনে কত কষ্ট পাই, তা বলতে গেলে ব'লবে যে মায়াকান্না

কাঁদছে। কেন না এখন সেদিন আর নেই। কোথা থেকে একটা গোলমাল মধ্যে থেকে বেধে গিয়ে আমার না হোক তোমার যে মন একেবারে ভেঙে গিয়েছে, এতে কোনই সন্দেহ নেই। এই মন ভাঙা-ভাঙির আগে কিন্তু এরই পাশা পাশি বাড়ীতে থেকে আমাদের কত কাল কেটে গেল, কিন্তু কোনদিন কোন মনান্তর তো দূরের কথা, তেমন কোন খুঁটিনাটিও হয় নি। আজ যদি মাহ্‌বুবার বাপ (আল্লাহ তা'কে জিন্নতে জায়গা দেন।) বেঁচে থাকতো, তা হ'লে কি তোমার তার বাপ-দাদার ভিটে এমন ক'রে ছেড়ে যেতে সাহস ক'রতে? এক দূর সম্পর্কের বোন না হ'য়ে তুমি যদি আমার মায়ের পেটের "সোদর" বোন হ'তে, তা হ'লে হয় ত আমার এতদিনের এতবড় অধিকারকে পা মাড়িয়ে যেতে পারতে না। মাহ্‌বুবার বাপ বেচারা তো চিরটা কাল আমার কাছে আপন ছোট ভাইটির মতই আদর আব্দার নিয়ে আসতো, ওতে আমার যে কত আনন্দ হোত, আমার বুক যে কি-রকম ভ'রে উঠতো তা আমিই জানি আর আল্লাহ্ জানেন। তুমি হয় ত ব'লবে যে সে অন্য সম্পর্কে আমার ছোট দেওরই ছিল, কিন্তু সত্যি ব'লতে গেলে শুধু তার জন্যে ত নয়, তোমার জন্যেও তার ওপর আমার স্নেহমায়াটা এত বেশী ক'রে প'ড়েছিল। তোমার বিয়ের কথা আমি উঠাই তার সঙ্গে সে সময় সে হাসতে হাসতে ব'লেছিল,—"ভাবী সাহেবা, আজকাল বৌ পসন্দ ক'রে নেওয়ার একটা হুজুগ প'ড়েছে, কিন্তু দেখছি আমার হ'য়ে আপনিই সমস্ত ক'রে দিলেন! তবে আমি এই ভরসায় রাজী হ'চ্ছি যে, আপনার মত ঝুনো দালালের হাতে ঠকবার কোন ভয় নেই!" আর সে কি হাসি! আজো আমার ওর অমনি কত কথা কত হাসি মনে প'ড়ছে। তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'বার পর সে আমায় সালাম ক'রতে এসে হেসে কুটি কুটি হ'য়ে বলেছিল,—"ভাবী সাহেবা, আজ থেকে কিন্তু আপনি আমার "জেড়-শা'স অর্থাৎ কিনা জ্যেষ্ঠ শ্যালিকা। আর আমাদের হিন্দুদের ঘরে জ্যেষ্ঠা শ্যালিকারা ছোট বোনের স্বামীর সাথে হাসি-ঠাট্টা ক'রলেও আমাদের সমাজে কিন্তু উলেটা নিয়ম, আর সে নিয়ম অনুসারে আপনার আমার সঙ্গে কথা কওয়া তো দূরের কথা, দেখা-শোনাও না হতে পারে।" আজ সে নেই, তার সে হাসিও নেই! ও আর নূরুটা গিয়ে আমাদের পাড়াটা যেন দিন-দুপুরেই গোরস্থানের মত সুন্‌শান হ'য়ে রয়েছে!

তারই একটি কণা স্মৃতি মরণ-কালে আমার হাতে সঁপে-দেওয়া মাহ্‌বুবা মা-জানকে যে তুমি এমন করে বেদিলের মতন আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, তা আমি কোন দিনই ভাবতে পারিনি! তোমার বোধ হয় মনে আছে,

ছেলেবেলার ও তোমার কোল থেকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ত এসে আমায় কোলে আমার দুধ খেতে, আর সে সময় শোফিতে আর ওতে কি রকম খামচা-খামচি চুলোচুলি হোত। তুমি যদি বা ভোল, সে ভুলবে না ; আমার বুকের রক্ত যে তার রক্তে মিশে র'য়েছে। আর তোমার কথাই বলি,—তুমি তো কোন দিনই আমার মুখের ওপর একটি কথা কইতে সাহস করনি,—কিন্তু সেই তুমি কি না যেই তোমায় ভাই তোমায় নিতে এলেন অমনি আমাদের সবারই ঘরগুষ্টির এত কাঁদন পায়ে-পড়া অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে উল্টে আরো পাঁচ কথা শুনিয়ে চ'লে গেলে ! কোন দিন তো তোমার কাছ থেকে এমন ব্যাবহারী পাইনি, তাই সেদিনকার কথাগুলো আমার বুকে যেন শেলের মতই গিয়ে বেজেছে। তুমি যে এমন ক'রে মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে পারবে, তা জানতাম না। তাই আগে থেকে প্রস্তুতও ছিলাম না। তুমি নূরুর ব্যাভারের যে খোঁচা দিয়ে গেলে, তা আমি স্বীকার ক'রে নিলেও, ওতে যে আমাদের নিজের কতটা দোষ ছিল, তা নিয়ে তুমিও ত আর কিছু অ-জানা ছিলে না। আমার পেটের ছেলে না হ'লেও আমার রবুর চেয়েও সে বেশী. সুতরাং তার এই ক্ষ্যাপানো হঠকারিতায় কি তোমার চেয়ে আমি কম কষ্ট পেয়েছি, না. সে কি আমারো বুক ভেঙে দিয়ে যায়নি ? তোমার চেয়ে যে সে আমারই অপমান ক'রেছে বেশী। আর মাহ্‌বুবাকে কি আমি কোনো দিন শোফির চেয়ে কম ক'রে দেখেছি ? সে যে এই রকমই কিছু একটা পাগলামী ক'রে ব'সবে, বিয়ের কথা আরম্ভ হ'তেই কি জানি কেন আমার মনে কেবলই ঐ শঙ্কা জাগছিল। কেননা এই পাগলা ছেলে কত বার বিয়ের কথা শুনেই এক দু'-মাস ক'রে এখানে ওখানে পালিয়ে বেড়িয়েছে। শুধু রবুর আর বৌমার জিদের আর উৎসাহের জন্যই আমি কিছু ব'লে উঠতে পারিনি, পাছে তারা মনে করে যে আমার মনটা শুধু অলক্ষুণে কথাই ভাবে। মা ছেলেকে যেমন বোঝে তেমন আর কেউ বোঝে না। আমি ওকে খুব ভালো ক'রেই চিনেছিলাম যে ও আমার বাউল উদাসীন ছেলে। তাই আমি কোনো দিনই তার বিয়ের জন্যে এতটুকু চিন্তিত হইনি বা আশাও করিনি ! মনে ক'রতাম, আহা থাক আমার ও কোল-মুছা ক্ষ্যাপা ছেলে হ'য়ে ! দু'দিন বাদে শোফিয়া শ্বশুর বাড়ী চলে যাবে। রবু সংসারী হ'য়ে ছেলে-মেয়েদের পেয়ে হয় ত বুড়ো মাকে আর মনে ক'রবে না, কিন্তু চিরদিন থাকবে আমার কোল ঠাণ্ডা ক'রে, এই চির-শিশু নুরু—এই ঘর-ছাড়া উদাসী ছেলে আমার ! হায়, মানুষ ভাবে এক আর খোদা করেন আর এক ! একটা হুজুগের মাতামাতিতে ছেলেই আমার এমন

ক'রে মালিক-উল-মউতের হাতে গিয়ে জানটা সঁপে দিল —এই রাক্ষসী লড়াইয়ে চ'লে গেল। আর আমি কিছু চাইনে বোন এখন, খোদার রহমে আর তোমাদের পাঁচ জনের দোয়াতে ছেলে আমার বেঁচে বাড়ী ফিরে আসুক — সে না হয় চিরটা দিন থুবড়োই থাকবে। বৌ-মার যেমন অনাশিষ্টি ঝোঁক, কি ক'রতে গিয়ে শেষে কি হ'য়ে গেল। কেন, আমার মাহ্‌বুবা মায়েরই কি বিয়ে হোত না, যে এমন অকাল ছুড়োর মতন কাড়াকাড়ি? আমি বি-এ এম এ পাশ করা সোনার চাঁদ ছেলে এনে তার বিয়ে দিতাম। তাতে যত টাকাই খরচ হোক। জমি জায়গা টাকা কড়ি কা'দের জন্যে? ছেলে মেয়েদের সুখী ক'রে তাদের মুখে হাসি দেখে তো আমরা চোখ মুদি, তারপর খোদা তাদের নসিবে যা লিখেছেন হবে! তখন তো আমরা আর কবর থেকে উঠে' তা দেখতে আসবো না। কথায় ব'লে—"চোখ মুদ্‌লে কেবা কার!"...যাক্' যা হ'য়ে গেছে, তা গিয়েছে, নসিবের উপর চারা নাই। তা নিয়ে অনুতাপ ক'রেও কোন ফল হবে না। কি করি মন বালাই—কোন মানা মানে না, তাই দু'টো কথা না ব'লেও পারি না! দু'-একবার মনে হয়, দূর ছাই। পরের ছেলেকে আপনার ক'রতে গিয়েও যখন আর হ'ল না, তখন আর কেঁদেই কি হবে— মন খারাপ ক'রেই বা কি পাব? হায় বোন, কিন্তু মন সে কথা বুঝতে চায় না। রাত্তির-দিন রোজা নমাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি, আল্লার নাম নিয়ে দুনিয়ার মায়া কাটাতে চাচ্চি, কিন্তু মেয়েদের বিশেষ ক'রেমা'দের মনে যে খোদা কি দুর্ব্বলতা দিয়েছেন যার জন্যে বেহেশতে গিয়েও আমাদের জান চায়েন হয় না। শুধু বাচ্চা-হারা বাঘিনীর মত অশান্ত মন কেঁদে কোঁকিয়ে মরে। আমারো হ'য়েছে তাই মুশকিল! জেন্দেগীর বাকী কালটা যে আল্লার নাম নিয়ে কাটিয়ে দেবো, তাও বুঝি তিনি কপালে লেখেন নি।

যাক্ বোন, এখন আসল কথা হ'চ্চে তোমরা ফিরে এস। বেশ হোল, বুকে এত বড় 'দেরেগে' শোক পাওয়ার পর দু'দিন বাপ-মায়ের বাড়ীতে বেড়িয়ে মন বাহালিয়ে নিলে, এখন আবার ঘরের বৌ ঘরে ফিরে এস। বাপ-মায়ের বাড়ীতে বেশী দিন থাকা 'আয়েব'ও বটে, আর তাতে মান-ইজ্জতও থাকে না। এখন তোমাকে তোমার শ্বশুর-কুলের আর মৃত স্বামীরই সম্মান রক্ষা করে' চলতে হবে। যে ঘরের বৌ তুমি, সে ঘরের মাথা উঁচু রাখতে তুমি সব দিক দিয়ে বাধ্য। রবুকে পাঠিয়ে দেবো পাল্কী নিয়ে তোমাদের আনবার জন্যে। আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু তা হ'লে ঘর দেখবে কে? বৌ বেটি ছেড়ে কি আমার কোথাও যা'ওয়ার জো আছে। আর রাগ অভিমান করিসনে বোন! তোরা সবাই মিলে যদি আমার মনে এমন ক'রে কষ্ট দিস, তা হ'লে দেখচি কোন দিন

বিষ খেয়ে আমাকে হারামী মউৎ মরতে হবে। আর না গেলে তো তোমাদের এই হাড়-জ্বালানো স্বভাব থামবে না। আমার মাহ্বুবা মাকে নিয়ে আর বেশী দিন সেখানে থাকা মস্ত বড় দোষের কথা। আইবুড়ো মেয়ে—হোক না মামার বাড়ী, লোকে ত দশটা কথা বলতে কসুর করবে না; আর তো শুনে তুমিও অতিষ্ট, তোতো-বেরক্ত হয়ে উঠবে। তোমরা যেদিন আসতে চাও, সেই দিনই শ্রীমান রবিয়ল বাবাজীরণ সেখানে পাল্কী নিয়ে গিয়ে হাজির হবে। তোমরা এর মধ্যে প্রস্তুত হয়ে থেকো। পত্র পাঠ উত্তর দিতে ভুলো না যেন, একথা আমি তোমার কাণ কামড়ে ব'লে দিচ্ছি!

খুকী যে তোর জন্যে "থোত দাদি দাবো—থোত দাদিদাবো" ব'লেমাথা খুঁড়চে এখানে! আর সেইপুতিনের আবার ছোট দাদির জন্যে এমন মাথা খুঁড়েখুঁড়ে কান্না।

হাঁ, আর একটা মস্ত জরুরী কথা,—ছাই ভুলেও যাচ্ছিলাম! আর কি কিছু মনের ঠিক-ঠাক আছে বোন! এখন মরণ হ'লেই বাঁচি।...ব'লছিলাম কি, আমাদের শোফিয়ার বিয়ে বৌমার ছোট ভাই মনুয়রের সঙ্গেই ঠিক ক'রেছি। রবু বোধ হয় চিঠি দিয়ে আগেই সে কথা জানিয়েছে। তুই এবার এসে সব কাজ দেখে শুনে গুছো এসে; শোফি তোরইত মেয়ে। আর, মাহ্বুবা মা না এলে শোফি বোধ হয় বিয়েই ক'রবে না! আমি বোন এ সই ঝামেলা সইতে পারবো না এ-মন নিয়ে!

সেখানকার সকলকে দর্জ্জামত সালাম দোওয়া দেবে। হাঁ, আর একবার তোর হাতে ধ'রে ব'লছি বোন আমরা দেখিস আনার নুরুকে কোন আহা-দিল্ বদ্ দোওয়া দিসনে যেন, বাছা আমার কোথায় কোন দেশে প'ড়ে র'য়েচে, হয় ত এতে তার অকল্যাণ হবে। ইতি—

তোমার বড় বোন
রকিয়া

শাহ্পুর,
১লা চৈত্র

বুবু সাহেবা!

তোমার চিঠি পেয়েছি। নানান কারণে উত্তর দেওয়া হয়নি!

মাহ্বুবটাও বোধ হয় বৌমার কিম্বা শোফিয়ার চিঠি পেয়েছে, তাই এই ক'দিন ধ'রে শুধু তার কাঁদো-কাঁদো ভাব দেখা যাচ্ছে।

আজ কালকার ছেলে-মেয়েরা এমনি বে-ইমান ! আমারই মেয়ে কিনা আমাকে ফাঁকি দিয়ে চ'লতে চায়। মাহ্‌বুবা এখন আমাকে দেখলেই এক পাশে স'রে যায়, চোখ মুখে তার কান্না থম্‌থম্‌ ক'রে ওঠে। বাপ্‌রে বাপ, এ কলিকালে আরো কত দেখবো বুবুজান,—দশ-মাস-দশ-দিন-গর্ভে-ধরা বুকের লোহ দিয়ে মানুষ করা একমাত্র মেয়ে, সেও কিনা দু:খিনী মায়ের বিদ্রোহী হয় ? গরীবের মেয়ের —যার দিন-দুনিয়ায় আপনার ব'লতে কেউ নেই, তার আবার এত গরব কিসের ? এ-সব দেখে আমার বোন দু:খও হয়, হাসিও পায়

তোমরা আমাদের খুবই উপকার ক'রেছ বুবুজান, আমরা গরীব হ'লেও সে উপকার ভুলে' যাবার মতন বেইমানী আমাদের মধ্যে নেই। আমাদের গায়ের চামড়া দিয়ে তোমাদের পায়ের জুতো বানিয়ে দিলেও সে ধার শোধ হয় না। তবে কথা কি জানো, আমরা গরীব, তাই হয় ত লোকের ভালো কথাও এসে অপমানের মতন আমাদের বুকে বাজে ! আর বোধ হয়, সেইজন্যই মনে ক'রছি তোমরা উপকার ক'রে মায়া-মমতা দেখিয়ে আজ আবার তারই খোঁটা দিচ্ছ ! বড় দু:খেই লোকে অন্যের কাছ থেকে সাহায্য নেয়। আমি যদি সমান দরের লোক হ'তাম তা হ'লে হয়ত খুব সহজেই তোমার ও উপকারে, অত স্নেহ-মায়া অসঙ্কোচে নিতে পারতাম ; কিন্তু আমি গরীব ব'লেই মনে করি, ও তোমাদের বড় মনের অসহায়ের প্রতি সহানুভূতি আর দয়া ভিন্ন কিছুই নয়। আর, ও নিতে আমার মন তাই চিরটা দিনই লজ্জায় ক্ষোভে অপমানে এতটুকু হ'য়ে যেত। মাহ্‌বুবার বাপ যতদিন বেঁচেছিলেন, তত দিন আমি ও কথা তোমায় বলি-বলি ক'রেও ব'লতে পারিনি আর ব'লতে গেলেও উনি ব'লতে দিতেন না। এতে হয় ত তুমি মনে বড় কষ্ট পাবে বুবুজান, কিন্তু আর সত্যি কথাটা লুকিয়ে নিজের মনের দংশন জ্বালা সইতে পারছিনে বলেই বড় কঠিন হ'য়েই এ কথাটা জানাতে হ'ল। আমার এত আত্মসম্মান থাকাটা কিছু আশ্চর্য্য নয়, কেননা আমি গরীবের ঘরের বৌ হ'লেও আমার বাপ মস্ত শরীফ ! এই সব অপ্রিয় কথাগুলো বলে তোমাকে খুবই কষ্ট দিচ্চি বুঝি, কিন্তু কত দু:খে যে আমার মুখ দিয়ে এ-সব নির্ম্মম কথাগুলো বেরোচ্ছে তা এক আল্লাই জানেন। উনি ত বেহেশতে গিয়ে নিশ্চিন্তি হ'লেন কিন্তু এ-অভাগীকে তুষের আগুনে একটু একটু ক'রে পুড়ে ম'রতে রেখে গেলেন ! এখন এই যে আইবুড়ো ধিঙ্গী মেয়ে বুকের ওপরে, এ তো মেয়ে নয়—আমার বুকের ওপর যেন ক'ল কাঠের আগুনের খাপ্‌রা। ওকে নিয়েই আমার যত ভাবনা, তা নৈলে আমার আর

চিন্তা কি ? উনি যে দিন চ'লে গেলেন, সেই দিনই এ পোড়া জানের ল্যাঠা চুকিয়ে দিতাম।

আমাদের এখানে কোনো কষ্টই নেই। ঐ হতভাগী মেয়ে বোধ হয় লিখে জানিয়েছে সব দরদী বন্ধুদের, না ? ও মেয়ে দেখছি দিন দিন আমারই দুষ্‌মন হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। হাড় কালি ক'রে ছাড়লে হতচ্ছাড়ী পোড়ারমুখী, তবু তার আর আশা মিটলোনা। এখন আমার কলজেটা বের ক'রে খেলেই ওর সোয়াস্তি আসে ! এই ঢিবী বেয়াড়া মেয়ে নিয়ে রাত দিন ঘরে বাইরে মুখনাড়া হাতনাড়া সহ্য ক'রতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে প'ড়লাম। য়্যা বড়-মানসী চা'ল, যেন কোন নবাবের মেয়ে ! সত্যি বোন, তোমরাই ওকে অমন আমিরজাদীর মতন শাহানশাহী মেজাজের ক'রে তুলেছ। এখন আমায় সর্ব্বদাই পাহারাদিয়ে থাকতে হয় তাকে, পাছে কখন কোন অনাছিষ্টি ক'রে ব'সে থাকে বা কারুর মুখের ওপর চোপা করে একটা ঝগড়া-ঝাটির পত্তন ক'রে বসে। খোদা আর কোনো দিকে সুখ দিলেন না।

ও'র মরবার আগে আমি মুখরা ছিলাম না ব'লে যে তুমি আমাকে দোষ দিয়েছ বুবুজান, সে তোমার বুঝবার ভুল। আমি চিরদিনই এমনি কাঠচোটা কথা ক'য়ে এসেছি, তবে তখন ছিল এক দিন আর আজ এক দিন। তখন আমাদের এ মন ভাঙাভাঙিও হয়নি আর তোমার ভালোবাসাটাও হয়ত সত্যিকারই ছিল, তাই আমার ও ঝাঁঝানো কথা শুনেও শুনতে না। আজ যেই মনের মিথ্যে দিকটা ধরা প'ড়েছে, অমনি তোমারও চোখে প'ড়ে গিয়েছে যে মাগী চশম-খোর মুখরা। এবার আরো শুনবে।

খামকা রবিয়ল বাবাজিকে কষ্ট করে এখানে পাঠিয়ো না বোন, আমি এখন যাবো না। আইবুড়ো জোয়ান মেয়েকে যদি এমনি করে নালতে শাকের মতন হাটে-বাজারে নিয়ে ঘুরে বেড়াই, তা সবারই বদনাম। তা ছাড়া, এখন মাহ্‌বুবাকে এখন থেকে নিয়ে গেলে আমার বাপ-মায়ের বা ভাইদের অপমান করা হয় না কি ? তাঁরা কি এতই ছোটলোক যে, তাঁদের ঘরের আবরু এমন করে নষ্ট হতে দেখে বসে বসে হুকো টানবেন ? আর একটা সত্যি কথা বলছি বুবু, রেগো না যেন। আমরা গরীব হ'লেও মানুষ, আমাদেরও মান অপমান জ্ঞান আছে। এত অপমানের পরও আমরা কোন মুখে সেখানে আবার মুখ দেখাব গিয়ে ? এখানে যদি কুকুর বিড়ালের মতও অবহেলা হেনস্থা হয় তাও স্বীকার তবু আর খোদা যেন সালার-মুখো না করেন। আমি দূর থেকেই সালারকে হাজার হাজার সালাম করছি বোন। তুমি ত শুধু নিজের দিকটা দিয়েই ঐ কুকুরগুলি কাণ্ডটা নিয়ে বিচার করেছ, কিন্তু এ গরীবদের

বেদনাটুকু বুঝতে হয় বোন সেই সঙ্গে। কথায় বলে,—তাঁতি তাঁত বোনে' আপনার দিকে ভাঁড় টানে! তোমারি দেখছি তাই। আচ্ছা এই যে মাহবুবার বাপ হঠাৎ মারা গেলেন, এটা কার দোষে, কোন বেদনার ঘা সামলাতে না পেরে? তা কি জানো? আমি তখখুনই বলেছিলাম, দড়াতে দড়িতে গিঁট খায় না, তা তোমাদের ঝোঁকে উনি সোজা মানুষ আমার কথা কানেই উঠালেন না! তারপর সত্যি সত্যিই "তেলি, না হাত পিছলে গেলি" ক'রে নুরু আপনার এক দিকে পালিয়ে গেল—পালিয়ে বাঁচলো, কিন্তু মাঝে প'ড়ে সববস্বান্ত হলাম আমরা-গরীবরা। মাহ্‌বুবার বাপ সে আঘাত সে অপমান সহ্য করতে না পেরে দুনিয়া থেকে সরেই পড়লেন, মেয়েরও আমার বুক ভেঙ্গে গেল, মা আমি আমার কাছে ত আর মেয়ে মন লুকিয়ে চলতে পারে না। মাহবুবা যতই চেষ্টা করুক, আমার আজ এটা বুঝতে বাকী নেই যে হতভাগী ম'রেছে। কিন্তু এও আমি ব'লে রাখলাম যে, আমি বেঁচে থাকতে যদি আমার এই মেয়ের ফের নরুর সঙ্গে বিয়ে হ'তে দিই তবে আমায় শাহজাদ্‌ মিয়া জন্ম দেননি! মাহবুবার বাবার উঁচু মন, তিনি মরণকালে তোমাদের সবাইকে ক্ষমা ক'রে গিয়েছেন, কিন্তু আমি আজো তোমাদের কাউকে ক্ষমা ক'রতে পারিওনি আর পারবোও না। এ সত্যি কথা আজ মুখ ফুটে বলে দিলাম। নুরুকে আমি বদ্‌ দোওয়া করবো না, সে যুদ্ধ থেকে সহি সালামতে ফিরে আসুক আমিও প্রার্থনা করছি, কিন্তু তাকে ক্ষমা করতে পারবো না তাই বলে। যে অপমান, যে আঘাতটা আমাদের সইতে হয়েছে তা অন্য কেউ হ'লে এতদিন তার হাজার গুণ বদ্‌লা নিয়ে তবে ছাড়তো! ·· যাক্‌ সে সব কথা, এ ভাঙা মন আর জুড়বেও না, আমিও সেখানে যেতে পারবো না "মন আমার কাচের বাসন, ভাঙলে ও মন আর জোড়ে না!" সালারেরও দানা পানি আমার কপালে আর নেই বোন, তা সেই দিনই ফুরিয়েছে যেদিন মাহ্‌বুবার বাপ মারা গিয়েছেন।—শুধু এ কথাটা মনে রাখবে।

আমার ভায়েরা বীরভূম জেলার শোঙানের এক খুব বড় জমিদারের সঙ্গে মাহবুবার বিয়ের সব ঠিক ঠাক ক'রেছেন! তিনি এক মস্ত হোমরা বুনিয়াদী খান্দানের, তবে বয়েসটা চল্লিশ পেরিয়ে পড়েছে এই যা। কিন্তু তাঁর আগের তরফের বিবির এক মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। তারো আবার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তারো ঘরে ছেলে মেয়ে। বরের বয়েসটা একটু বেশী, তা হলে আর কি করবো। গরীবের মেয়ের জন্য কোন নওয়াবজাদা বসে আছে বল। এই মাসেই বিয়ে হ'য়ে যাবে। মাহ্‌বুবাও মত দিয়েছে,—এ শুনে তোমার তো আশ্চর্য্য হবেই, আমি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছি। ..আল্লাহ এত দুঃখও লিখেছিল অভাগীর কপালে। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে বুবু সাহেবা বুক ফেটে যাচ্ছে!

যাক্ তোমাদেরও দাওত্ করলাম, এসে এই দুঃখের বিয়ে দিয়ে যেয়ো—মায়ের আমায় বিসর্জন দেখে যেয়ো বোন! যদি না আসতে পারো, তবে সবাই মিলে দোওয়া করো যেন পোড়ারমুখী সুখী হয়।

মা সোফিয়ার বিয়েতে যেতে পারবো তা আর মনে হয় না বুবুজান। তা হলে আমার ঘরের এ-কাজ দেখবে কে? আমি আমার জান দিল থেকে দোওয়া করছি, খোদা আমার সোফি মাকে রাজ-রাণী করুন। তার মাথার সিঁদুর হাতের পঁইচি অক্ষয় হোক। বেশ সুন্দর হবে, মনুয়রের সাথে ওকে, মানাবেও মাণিক-জোড়ের মতন। আমি এদৃশ্য দেখতে পারলাম না বলে ছটফট্ করছি।

আবার লিখছি বোন খামখা রবু বাবাজিকে আমাদের নিতে পাঠিয়ো না, পাঠিয়ো না! অনর্থক হালাক হয়ে ফিরে যাবে। আমি জান থাকতে সেখানে যেতেও পারবো না আর মাহ্‌বুবার এ বিয়েও বন্ধ করতে পারবো না।

বউ-মাকে আর সোফিয়াকে আমার বুক-ভরা স্নেহ আশীষ দেবে! খুকীকে আমার চুমো দেবে, আমি বাস্তবিকই তার বে-দরদ দাদি!

আসি বুবুজান, মাথাটা ঘুরে আসছে। আবার আমার পুরোন ভিরমী রোগটা ক'দিন থেকে কষ্ট দিচ্ছে!—

তোমার ভাগ্যহীনা ছোট বোন
আয়েশা

সালার
২৭শে চৈত্র, রাত্তির

দুষ্ট সাহসিকা

তোর সাথে এবার দেখছি সত্যিকার আড়ি দিতে হবে। বাহা রে দুষ্ট ছুঁড়ি। আমি না হয় সংসারের ঝঞ্ঝাটে পড়ে তোকে কিছুদিন চিঠি দিতে পারিনি তাই বলে তুইও যে গুমোট মেঘের মত অভিমানে মুখ ভারী করে বসে বসে থাকবি—হায় রে কপাল তা কি আর জানতাম? আজ আমাদের সেই ছেলে বেলা, সেই অভিমানে অভিমানে "কান্না-হাসির পৌ-ফাল্গুনের পালা" সেই ম'দের সোহাগ,—সবকথা মনে প'ড়ছে রে বোন, সব কথা আজ যেন চোখের জল ভিজে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দুনিয়ার কেমন ক'রে কার সাথে সহসা যে চেনা-শুনা হ'য়ে যায়, দুইটি হিয়াই কেমন ক'রে যে কপোত-কপোতীর মত সারাক্ষণ অন্তরের নিভৃততম কোণে মুখোমুখি বসে গোপন কূজনে হিয়ার

গগণ ভরিয়ে তোলে, তা সবচেয়ে সেই সময় চোখের জলে লেখা হয়ে দেখা দেয়, যখন তাদের এক ব্যথিত অজানা দিনের জন্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

দ্যাখ সই আজ যখন আমার বড় কষ্ট বড় দুঃখ, সেই সময় একটি ব্যথা-পাওয়া সখীকে কাছে পেতে হেন আমার আশা দিকে দিকে ঘুরে ম'রছে। আমার বুকে যে আজ কথার ব্যথা জ'মে জ'মে পাহাড়পারা হ'য়ে উঠেছে বোন, কেননা আমার খেলার সাথীটিও মুক হয়ে গিয়েছে। পরের বেদনায় নিজের বুক ভ'রে আমরা দুটি চিরপরিচিত জনও কেমন যেন পরস্পরকে হারিয়ে ফেলেছি। এই হঠাৎ-পাওয়া বেদনার বিপুলত্ব আমাদের দুজনকেই কেমন স্তম্ভিত ক'রে ফেলেছে, যাতে ক'রে এ নিবিড় বেদনার অতলতা আর কিছুতেই আমাদের সহজ হ'তে দিচ্ছে না! কি হ'য়েছে, সব কথা বলি শোন।

তোর পথিক-ভাই নূরুটার সব কাণ্ড-কারখানা তো জানিস।—আজ কিন্তু তোর ওপরেও আমার কম রাগটা হচ্চে না রে 'সাহসী'! তুই তাকে রাত-দিন-"পাগল-ভাই আমার" "পথিক-ভাই আমার" ব'লে ব'লে যেন আরো ক্ষেপিয়ে তুলেছিলি, দোলা দিয়ে তার জীবন-স্রোতকে আরো চল-চঞ্চল ক'রে তাতে হিন্দোলের উদ্দাম দোল এনে দিয়েছিলি। আমি তার বেদনায় এতটুকু নাড়া-ছোঁওয়া না দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে শান্ত করবার মতলব আঁটছি, এমন সময় তুই তোর বুক-ভরা বেদনা-ঝঞ্ঝা এনে তার ব্যথার প্রশান্ত মহাসাগরে দুরন্ত কল্লোল জাগিয়ে গেলি! সেই ঝঞ্ঝায় ঝাকানি আর ঢেউ-এর হিন্দোল উচ্ছ্বাসই তাকে ঘর-ছাড়া ডাক ডেকে শেষে আগুনের মাঝে গলা জড়াজড়ি করে ঝাঁপিয়ে প'ড়লো। এই চির-বঞ্চিতের জীবন-যাত্রা বড় দুর্ব্বিসহ। এই বিড়ম্বিত হত ভাগ্যেরা যেমন রাক্ষসের মত স্নেহ-বুভুক্ষু, তেমনি অস্বাভাবিক অভিমানী।

এই ক্ষ্যাপার শিরায় শিরায় রক্ত যেমন টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটেছে, স্পর্শালুতাও তেমনি তীব্র তীক্ষ্ণতা নিশে ওঁত্‌ পেতে রয়েছে। সকল দুখ বেদনা আঘাতকে হাসিমুখে সহ্য ক'রার বিপুল শক্তি এদের আছে, এদের নাই শুধু স্নেহ সোহাগের একটু ছোঁওয়ার আবছায়াতেই এদের অভিমান-মথিত বুকে বিরাট ক্রন্দন জাগে। এইখানেই এরা সাধারণ মানুষের চেয়েও দুর্ব্বল!

নূরুর ব্যথার সরসীতে যেই শৈবালের সর প'ড়ে আস্‌ছিল, অমনি তুমি এসে একেবারে তার বেদন-ঘায়ে পরশ বুলিয়ে তাকে ক্ষিপ্ত ক'রে তুললি। তার ঘুম-পাড়ানো চিতাকে সজাগ ক'রে দিলি! নিজে তো গৃহ-বাসিনী হলিনে, সাথে সাথে আর এক মুগ্ধহরিণকে তার বনের কথা মনে করিয়ে দিলি।—তোর ও দুরন্তপনা দেখে দেখে তাই আমার ভয় পাচ্ছে, পাচ্ছে তুইও না মাথায় পাগড়ী

বেঁধে যুদ্ধে চলে' যাস। যেমন দুষ্ট সরস্বতী মেয়ে, তেমনি নামও হ'য়েছে—সাহসিকা।

কিন্তু বিয়ের বেলায় তো সাহস হয় না লো! গা'টা হেল-ফেলিয়ে উঠছে, না?

হাঁ কি হ'য়েছে শোন।

নূরুর সাথে মাহ্‌বুবার সেই বিয়ের সমস্ত বন্দোবস্তের পর ত নূরটা যুদ্ধে চ'লে গেল—বনের চিড়িয়া বনে উড়ে গেল, কিন্তু তার শূন্য পিঞ্জরটি বুকে নিয়ে একটি বালিকা নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগলো। এ হতভাগী আর কেউ নয় বোন, এ হচ্ছে তোর বাচ্চা সই মাহ্‌বুবা।

মাহ্‌বুবার বাবাজান হঠাৎ মারা প'ড়লেন দেখে তার মামারা এসে তাদের নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন, অনেক কাঁদাকাটি ক'রে পায়ে ধ'রেও রাখতে পারলাম না। মাহ্‌বুবার মা-জান যে এমন বে-রহম তা আগে জানতাম না ভাই।

এই রাক্ষুসী-মায়ের পরের কাণ্ডটা শোন। এখান থেকে নিয়ে গিয়ে মাহ্‌বুবাটাকে ধরে বেঁধে একচল্লিশ বছরের বুড়ো এক জমিদারের সাথে তিনি বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। খবর পেয়ে আমরা সকলে সেখানে গিয়ে কেঁদে পড়ি, তাঁর পায়ে আমরা ঘর-গুষ্টি মিলে মাথা কু'টে কু'টেও তাঁর মত ফেরাতে পারেনি। জোর করে বিয়ে থামাতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তাতেও কোন কিছু হয়নি; মারামারি করতে গিয়ে তোর সয়া হাতে খুব জখম হয়েছেন। তবে একেবারে ঘায়েল নয়। ঘায়েল হয়েছে ঐ মন্দভোগী মাহবুটা সে এখন শ্বশুরবাড়ীতে—শেঙানে। আহ্—বিয়ের দিনে সে কি ডুকরে ডুকরে তার কান্না রে 'সাহসী', তা দেখে পাষাণও ফেটে যায়! তবু ঐ বে-দিল মায়ের জানে একটু রহম হল' না। মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর আবার কান্না কত! এই গোলমালে শোফির আর মনুর চার হাত এক হতে দেরী হয়ে গেল।

এ বিয়েত তোকে আমরা ধরে আনবো গিয়ে। আসতেই হবে কিন্তু। কোন মানা শুনছিনে, বুঝলেন শিক্ষয়িত্রী মহাশয়া!

তোর পথিক ভাই পাগলা নূরুটাও আসতে পারে এ বিয়েতে। তুই এলে এবার বনবে ভালো। জানিনে হতভাগা এ আঘাত সইতে পারবে কি না!—যাচ্ছা হয়েছে—খুব হয়েছে—যেমন অবহেলা, তেমনি মজা! এখন মতির মালা বানরে নিয়ে গেল। কথায় বলে,—"কপালে নেই ঘি, ঠক্-ঠকালে হবে কি?"

নূরুটা ক্রমেই স্রষ্টার প্রতি বিদ্রোহী হ'য়ে উঠছে দেখছি, আবার এ খবর শুনলে তো সে বিধাতা পুরুষের সপ্ত-পুরুষ উদ্ধার ক'রবে। আমাদের বুক কাঁপে রে ভাই ভয়ে দুরু করে পাছে কোন অমঙ্গল হয়। তার চিঠির যদি ঝাঁজ দেখতিস। উঃ, যেন একটা বিপুল ঘূর্ণীবায়ু হু-হু-হু-হু ক'রে ধুলো উড়িয়ে সারা দুনিয়াটাকে আঁধার ক'রে তুলতে চাইছে।——আমি তার চিঠির এক বর্ণও বুঝে উঠতে পারিনে বোন, এক বর্ণও না। শুধু বুঝি, একটা তিক্ত কান্নার তীব্রতা যেন তাকে ক্রমেই শুষ্ক তীক্ষ্ণ ক'রে ফেলছে।—খোদা ওকে শান্তি দিন।

চারদিককার এই গোলমালে আমার মনের শান্তি একেবারে উবে গিয়েছে। আমার এই সাজানো ঘর যেন আজ আমাকেই মুখ ভ্যাঙাচ্ছে।

মা আর শোফিও আলাদা জীব হ'য়ে উঠেছেন আজকাল। মায়ের দুঃখ অনেক, কিন্তু এই কচি মেয়ে শোফিটা? তুই এলে তবে একবার ওর গুমোর ভাঙে। মাগো মা, রাত-দিন মুখ যেন ভার হ'য়েই আছে। ছুঁতে গেলেই নাকে-কান্না। এমন ছিঁচ-কাঁদুনে ছুঁড়ি ত আমি আর জন্মে দেখিনি, যেন রাঙ্‌তার টেকো আর কি?

আর লজ্জার কথা শুনেছিস্ রে 'সাহসী'? আজকাল সে তোর ভয়ানক ভক্ত হ'য়ে উঠেছে। এখন কথায় কথায় তোর নজির দেওয়া হয়, "সাহসী দিই তো ভাল কাজ করেছেন—বিয়ে করা একেবারে বিশ্রী কাজ, আমিও চির-কুমারী থাকব" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার তো চক্ষুস্থির। ওরে বাপ্‌রে,—এখন তুই এসে ওকে তোর কাছে নিয়ে গিয়ে এক আধটা শিক্ষয়িত্রীর পদ টদ খালি থাকে তো দিয়ে দে। বেশ চেলা জোটাচ্ছিস কিন্তু ভাই। আমি বলি কি তোরা যত সব চির-কুমারী আর চির-কুমারের দলে মিলে একটা নেড়া নেড়ীর দল বের কর। কেমন লো, কি বলিস্?

তোর বর না হয় তোর রূপ-গুণের জৌলুস দেখে ভয়েই পিঠটান দিল, কিন্তু আমাদের এই শ্রীমতী শোফিয়া খাতুনের ঝগড়া করা আর নাকে-কাঁদা ছাড়া অন্য কি গুণ আছে, যাতে ক'রে তাঁর "অচিন-প্রিয়তম" তাঁকে ত্যাগ করে গেলেন? কিন্তু এইখানে কথা হচ্ছে, যে এই ঝগড়াটে ছুঁড়ির আবার "প্রিয়তম"ই বা কে? সে কি কোন পরীস্থানের শাহাজাদা উজীরজাদাকে খোয়াবে-টোওয়াবে দেখেছে নাকি? এ সব কথা তুই-ই এসে জিজ্ঞেস করবি ভাই, আমি বলতে গেলে এখন আমায় সে লাঠি নিয়ে তাড়া করে আসে। জানি না, ওঁর "পীতম্" কোন গোকুলে বাড়ছে। কিন্তু দেখিস ভাই, এসে ওকে যেন আবার চেলা বানিয়ে নিসনে!

আর, তুই নিজে কি এমনি সান্ন্যাসিনীই রই বি ? হায় রে শ্বেত-বসনা সুন্দরী, তোর বসন্ত বৃথাই গেল ! চোরের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ভুঁইএ ভাত খাবি না কি ? আয়তো এখানে একবার, তার পর মনে করেছি কি, তোকেও একটা বুড়ো হাবড়া বর জুটিয়ে দিয়ে 'নেকা' দিয়ে দেব ! কি বলিস, বিবি হ'তে পারবি ত ? তবে আজ এখন আসি। ইতি—

তোর ভুলে যাওয়া সই
রাবেয়া

বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রথম বৈশাখ (সকাল)

ভাই রেবা !

আজ যে নতুন বছরের প্রথম দিনের প্রথম সকালে তোর নামটাই সর্ব্বপ্রথমে আমার মনের কোণে উঁকি মারলো, আমার এ বিপুল আনন্দের নিবিড় মাধরী তুই হয় তো বুঝবিনে; কেন না, তুই এখন ঘরের লক্ষ্মী, তোর ভালবাসা পাবার আর দেবার অনেক লোক আছে, কিন্তু আমাদের তো আর পোড়াকপালে সে সব কিছু জুটলো না। আমার বন্ধু আছেন অনেক, কিন্তু সে সব মামুলী, তাঁদের সঙ্গে শুধু লৌকিকতার খাতিরটুকু মাত্র, প্রাণের সঙ্গে কারুর কোথাও এতটুকু মিল নেই। তোকে যেমন অসঙ্কোচ একেবারে সেই ছেলেবেলাটার মতন সহজ হ'য়ে আমার অন্তরের বাইরের সব কিছু জানাতে পারবো, এমনটি তো আর কাউকে পারবো না ভাই ! আমার ভেতরটা এই নীরস কাঠ হ'য়ে উঠছিল, তখন তার এই হঠাৎ-পাওয়া ছোট্ট চিঠিখানি যে কত অন্তরতম বন্ধুর মতন সেই শুকনো হিয়ার পরশ বুলিয়ে তাকে আবার ফুলে ফসলে ভরিয়ে তুললে, তা আমার এই ভাবাবেগময়ী লিপি-দূতীর চেহারা দেখেই বুঝতে পারবি।

এত দিন তোর 'সাহসী' সই 'পুয়াল-চাপা' ছিল, তার কাঠামোটা নিয়ে যিনি এত দিন এই কলকাতা শহরের মহিলাদের পর্দ্দাপার্কে মাঝে মাঝে রাস্তায়, বোর্ডিং-এ স্কুলে গম্ভীরা হ'য়ে বেড়িয়ে বেড়াতেন, তিনি হচ্ছেন, মিস্ সাহসিকা-বোস্। বুঝলি ? শুধু কি তাই ! এক প্রখ্যাত ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হোমরা চোমরা গ্রাজুয়েট, তদুপরি অনুপমা সুন্দরী, বিদুষী, কলা-সরস্বতী। আমার আরো অনেকগুলো বিশেষণ আছে, সেগুলো আর চিঠিতে জানাচ্ছিনে, তোকে একবার আমার এই কুঞ্জ-

কুটীরে এনে হাতে কলমেই দেখানো যাবে। তুই এতক্ষণ বোধ হয় তোর দুষ্ট হাড় জ্বালানো ননদিনী শোফিকে ডেকে এনে খুব কুটি-কুটি হ'য়ে হাসছিস, নয় ? সত্যি ব'লছি ভাই রেবা, এ আর আমি কি ব'ললাম, আমার সব মহিলা বন্ধুরা আমাকে কোন নতুন-দেখা সুন্দরীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে এই রকম যে পাঁয়তারা কসরৎ ক'রে যে অহম্ সুর-সুন্দরীর গুণ-ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন করেন, তা শুনে শুনে আমারও অনেক সময় মনে হয়,—নাঃ, আমি আর এখন কেউ-কেটা নই। যেই ভাবা, আর যায় কোথা, অমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রাবৃট-মেঘের মতন গুরু-গম্ভীর হ'য়ে পড়া ! প্রথম প্রথম দিন কতক একটু অসোয়াস্তি বোধ হ'ত কিন্তু এখন দিব্যি স'য়ে গিয়েছে ; শুধু স'য়ে গিয়েছে ব'ললে ভুল হবে, এখন বরং কোন জায়গায় ঐ রকম বিশেষণে বিশেষিত অভ্যর্থনা না পেলে মনে একটু রীতিমতই লাগে। দেখেছিস এই সব মিথ্যা বাজে জিনিসের ওপরও আমাদের মায়া কত বেশি।

আজ যে আমি তবে হাল্কা বা খেলো হ'য়ে পড়েছি তোর কাছে' তার কারণ. আমি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে যে দিকে যতই বাড়ি, তোর কাছে ঐ বাঁদরী ছুঁড়ি, লো বটে, খুব জোর 'সাহসী' বেশি বিশেষণে তো আর জীবনে কখনো বিশেষিত হ'লামও না আর ভবিষ্যতে যে হবও না তার প্রমাণ তোর এই এতদিন পরের চিঠিটা ! তাই আমার অতগুলো মর্দ্দানী মেজাজ সত্ত্বেও এবং এক মস্ত ধিঙ্গী আইবুড়ো মাগী হ'য়েও আজ শুধু মনে হ'চ্চে আমাদের সেই বাঁকুড়ার চুলবুলে' সাহসী ছুঁড়ি এসে আমার মনের আসনে জোর গেদে' ব'সেছে। এখন আমার কি মনে হ'চ্ছে বুঝালি লো 'খুকীর-মা' ? এখন বড্ডো সাধ যাচ্ছে যে, সেই আমাদের কিশোরী জীবনের মতন দুই সই-এ পা ছড়িয়ে চুল এলিয়ে পাশাপাশি ব'সি আর খামচা-খামচি নুচোনুচি খুনসুড়ি মস্তানি করি এবং সঙ্গে সঙ্গে খুব পেট ভ'রে মা'দের গাল খাই ! নয় তো তোর ঐ এক বোঝা চুল নিয়ে বেণী গাঁথতে তেমনি মশগুল হ'য়ে যত সব রাজ্যের ছিষ্টি-ছাড়া গপ্পো করি। এখন আমি এই চিঠি লিখচি তোকে আর আপনাতে আপনিই বিভোর হ'য়ে গিয়েছি ! আঃ কেমন করে মানুষের কত পরিবর্তন হয় বোন ! আমার এত আনন্দের বাজার কে ভাঙলে আর কেমন ক'রেই বা ভাঙলো তাই ভাবতে গিয়ে অনেক দিন পরে আমার চোখের পাতা ভিজে এলো !

দ্যাখ ভাই রেবা, নারীর নারীত্ব কিছুতেই ম'রবার নয়, এ কথাটা আজ আমি খুবই বুঝতে পাচ্চি। তার কারণ ব'লছি তোকে, শোন ! ..নানান দিক থেকে নানান রকমের ঘা আর আঘাত খেয়ে খেয়ে যখন আমার ভিতরের নারীর মাধুরী সমস্ত পেলবতা নমনীয়তা ক্রমেই হিম জমাট হ'য়ে আসতে

লাগলো, তার ওপর রাত-দিন মর্দ্দানী কায়দা-কানুনের চাপে চাপে অন্তরের নারী আমার অহল্যার মতই পাষাণ হ'য়ে গেল, তখন আমি সব বুঝতে পারলাম মাত্র, কিন্তু না পারলাম কাঁদতে না পারলাম তেমন কিছু বেদনা অনুভব ক'রতে! হায় রে বোন, তখন যে আমি পাষাণী! আমার কি আর তখন কোন কোমল অনুভূতি জ'মে পাথর হ'তে বাকি আছে, যে তার সাড়া পেয়ে বাকি অনুভূতি-গুলো একটু নড়া-চড়া ক'রেও উঠবে! ঐ পাষাণ-বুক নিয়ে শুধু শুকনো অশ্রুহীন কাঁদন কেঁদেছি যে, হায়, আমার আর মুক্তি নেই—মুক্তি নেই। অহল্যারও মুক্তি হয়েছিল, কিন্তু আমার মুক্তি নেই – নেই! আমার মনে হ'ল ঐ অহল্যা নারী যখন পাষাণ হ'য়েছিল, তখন তার মাঝে যে আমিও ছিলাম! আজ আবার এই আমার মাঝে সেই অহল্যা তার পাষাণী মূর্ত্তি নিয়ে এসেছে, কিন্তু এবার যেন মুর্তিটাকে বাদ দিয়ে। এই আমির মাঝে আমার সেই বহুযুগ আগের আমি তো নেই, তার যে মৃত্যু হ'য়েছে!...এত দুঃখ আমার বোন, কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও কাঁদতে পারিনি! জীবনের যত দুর্ঘটনা যত রকম সম্ভব করুণ ক'রে মনে ক'রে কাঁদতে চেষ্টা করেছি; মার বাবার ফটোগুলো, তাঁদের হাতের লেখা ইত্যাদি সামনে ধ'রে আমার জীবন-ভরা হারানো প্রিয় মুখগুলি মনে ক'রে ক'রে যতই কাঁদতে গিয়েছি, ততই খালি কাপাস হিম হাসি ঠোঁটের কোণে এক রেখা ম্লানিমার মত মাত্র ফুটে' উঠছে! ভাব দেখি একবার এই দুর্বিসহ যাতনার বিড়ম্বনা। নারী, বিশ্বের সব কিছু কোমলতা আর মাধুর্য্য সুষমা দিয়ে গড়া নারী, হাজার ক'রেও তার বুকে কান্না জাগে না, বেদনা ও আঘাত দিতে পারে না। এর যাতনা আর ছট্-ফটানি বুঝিয়ে ব'লবার নয় রে বোন, এ কষ্ট যার হৃদয় কখনো এমনি শুকিয়ে ঠন্-ঠ'নে পাথর হ'য়ে গিয়েছে সেই বুঝবে!...বৈশাখের কান্না দেখেছিস? তার ঐ হু-হু-হু-হু রোদ্দুরে ধু-ধু-ধু-ধু গোবি-সাহারায় ধুলো-বালি, শন্-শন্-শন্-শন্ শুকনো ঝড়-ঝঞ্ঝা, পাহাড়-ফাটা শুষ্কতার বিপুল চড়্‌চড়ানি, দীর্ণ বিদীর্ণ রুক্ষ খোঁচা খোঁচা উলঙ্গ মূর্তির রুদ্র বীভৎসতা আর খাঁ খাঁ নগ্নতার হাহাকার ক্রন্দন শুনেছিস? তার ঐ কঠোর কাঠচোটা অট্টহাসির খনখ'নে কাংস্য আওয়াজের মাঝে সারা বিশ্বের বিধবার অশ্রুহারা সকরুণ কান্নার নীরব ধ্বনি শুনেছিস? এ বিষাক্ত তিক্ত কাঁদন বুঝিয়ে ব'লবার নয় রে বোন' এর লক্ষ ভাগের এক ভাগও বাইরে প্রকাশ ক'রে দেখানোর ক্ষমতা আমার নেই। এ শাস্তি যেন অতি বড় দুশ্মনেরও না হয়! এই তো সব চেয়ে বড় বড় নরক-যন্ত্রণা। এই তো তোদের 'হাবিয়া দোজখ'! এতে মানুষ মরে না বটে, কিন্তু এই কূট হলাহল-যন্ত্রণা তাকে নিশিদিন জবাই

করা অসহায় প্রাণীর মতন ছুট-ফটিয়ে কাৎরিয়ে মারে ! শিব নাকি সমুদ্রমন্থনের সমস্ত বিষ পান ক'রে নীলকণ্ঠ নাম নিয়েছেন, কিন্তু তিনি যত বড় দেবতাই হন, তাঁর শক্তি যত বেশি অনির্ব্বাচনীয়ই হোক, আমি জোর ক'রে বলতে পারি, যে, এই অশ্রুহীন কান্নার তিক্ত বিষ এক ফোঁটা গলাধঃকরণ করলেই তাঁর কণ্ঠ ফেটে খান্ খান্ হ'য়ে যেত ! তবে আমরা যে এখানো বেঁচে আছি ? হায় রে বোন ! আমরা যে মানুষ—রক্ত-মাংসের মানুষ, আমাদের শরীরে যা সয়, তা যদি দেবতাদের শরীরেও সইতো তবে তাঁরা এত দিন দেবতা না থেকে মানুষ হ'য়ে জ'ন্মে মুক্তিলাভ ক'রতেন। কেন না দেবতাদের চেয়ে মানুষ ঢের, ঢের অনেক—অনেক উঁচু। তাঁদের যে একটা অমানুষিক শক্তিই র'য়েছে সমস্ত সহ্য ক'রবার। কিন্তু মানুষের এই ক্ষুদ্র বুকের ক্ষুদ্র শক্তির সহ্যগুণ ক্ষমতা যতটুকু তার চেয়ে অনেক বিপুল বহু বিরাট দুখ-কষ্ট ব্যথা-বেদনা আঘাত-ঘা যে সহ্য ক'রতে হয় ! এত কষ্টেও কিন্তু সে সহজে মরে না ! মরণ এ দুঃখীদের প্রতি বাম। তার রথ এ-সব আর্ত্তদের পথ দিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, এ বিড়ম্বিত হতভাগাদের কর্ণে দূরাগত চাকার ধ্বনিও শ্রুত হয় না। বৃথাই সে হাঁক-ডাক মারে,...“মরণ রে, তুহুঁ মোন শ্যাম সমান।” কিন্তু শ্যাম ততক্ষণে অন্ধকার পথ দিয়ে মরণ-ভীতুদের কানে গিয়ে তাঁর মৃত্যুবাঁশীর বেলাশেষের তান শুনাল।...

হ্যাঁ, কি জন্যে তোকে এত কথা জানিয়ে বা বাজে ব'কে বিরক্ত ক'রলাম, তা পরে জানাচ্ছি। এখন, কি কথা থেকে এত সব প্রাণের কথা এসে প'ড়লো শোন্।...আমি বলেছিলাম যে, নারীর নারীত্ব কিছুতেই মরবার নয়। সত্যি-সত্যিই বোধ হয় অহল্যা নারী চিরকাল পাষাণী থাকতে পারে না। নারীই যদি পাষাণী হ'য়ে যায়, তবে যে বিশ্ব সংসার থেকে লক্ষ্মীর কল্যাণী মূর্ত্তিই উবে যায়, আর বিশ্বও তখন কল্যাণ হারা হয়ে তৈলহীন প্রদীপের মতই এক নিমেষে নিবে গিয়ে অন্ধকার হ'য়ে যায়। এই কল্যাণী নারীই বিশ্বের প্রাণ ! এ 'নারী' হীন হ'য়ে গেলে বিশ্ব-প্রাণের স্পন্দনও এক মুহূর্ত্তে থেমে যাবে ! আমি যখন নিজেকে নারীত্ব-বিবর্জ্জিতা এক পাষাণী প্রতিমা মনে ক'রে অমনি অশ্রুবিহীন মৌন ক্রন্দনে আমার মর্ম্মর পাষাণ মর্ম্ম-কন্দরের আকাশ-বাতাস নিয়ত বিষাক্ত তিক্ত আর অতিষ্ঠ ভারী ক'রে তুলছিলাম, তখন তোর ঐ চিঠির লেখার গোটা কয়েকমাত্র আঁচড় কি ক'রে বুকের এক দিককার এতভারী পাষাণ তুলে ফেলে অশ্রুর একটি ক্ষীণ ঝরণাধারা বইয়ে দিলে ? কি ক'রে আজ আমার অনেক দিনের বাঞ্ছিত কান্না তার মধুর গুঞ্জনে আমার মূক্ মন-সারীর মুখে বাক ফুটালে ? তাই ভাবছি আর বড় বড় প্রাণ ভ'রেই এই কান্নার মৃদুল মধুর বুদ্বুদ-

ভাষা প্রিয়তমের বাঁশীর পাৎলা পিটকিরির মতই আবেশ-বিহ্বল প্রাণে শুনচি ! তোর চিঠিটা এত দিন পরে এমনি না-চাওয়ার পথ দিয়ে হঠাৎ আমার পাষাণ-দেউলের খিড়কিতে এসে আচম্‌কা ঘা না দিলে তা যে এত সহজে খুলতো না, তা আমি এখন বেশ বুঝতে পাচ্চি। এ যেন দোর-বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে একেবারে অপ্রত্যাশিত প্রিয়জনের মুখে ডাক নাম ধ'রে আহ্বান শুনে চ'মকে দোর খুলে দিয়ে পুলক লাজে অপ্রতিভ হওয়া ! কিন্তু এখন আবার ভয় হ'চ্ছে বোন যে এ-দোর অভিমানে আবার বন্ধ হ'তেও তো দেরি না হ'তেও তো পারে ! অনেক কালের পরে ফিরিয়ে প্রিয়জনকে দেখে বুকে হরষও যেমনি জাগে, তার পিছু পিছু অভিমান ক্রন্দনও তেমনি জলভরা চোখ নিয়ে এসে যে দাঁড়ায় ! তাই বলি কি তুই এমন অপ্রত্যাশিত পথ দিয়ে এমনি ক'রে আচম্‌কা কুক্ দিয়ে আমার মর্ম্মর মন্দিরের পাষাণ অর্গল খুলে ফেলিস ! এখন আমার যা মনের অবস্থা, তাতে যদি তুই রোজ এসে এমনি ক'রে দেখা দিস তা হ'লে হয় তো আবার মনের খিড়কি বন্ধ হ'য়ে যাবে। কি বলিস ভাই ? লক্ষ্মীটি, এতে যেন অভিমানে তোর পাৎলা অধর ফুলে ওঠে। তোর সেই হারিয়ে যাওয়া 'সাহসী' সইটিকে আগে এই গম্ভীরা শিক্ষয়িত্রী মহাশয়ার মাঝে জাগিয়ে তোল, তা হ'লে আবার নয় তো শিঙ ভেঙে বকন হওয়া যাবে। উপমাটা নেহাৎ ওঁচা হয়ে প'ড়লো, না লো ? সে যাইহোক তোমার সেই চির-কিশোরী সাহসীটা যে ম'রেছে, একদম মরেছে লো। তাকে বাঁচাতে হ'লে কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় রস আনতে হবে। বুঝলি ? পারবি তো ? দেখিস, বেহায়া ছুঁড়ি তুই যেন এই অবসরে আমার জন্যে বরাদ্দ করা চোখে-চালসে-লাগা বুড়ো হাবড়া বলদ বরের দোহাই পাড়িস নে ! হ্যাঁ, লো ! আমার এখনো বিয়েই হোলো না, আর এরই মধ্যে নিজের জন্যে কোন হাবড়া বুড়োকে মোতায়েন ক'রলি ? তা ভাই, তোর যদি কোন নানাজি বা দাদাজি থাকেন তা হলে খবর দিস, এক দিন বর পছন্দ করতে না হয় যাওয়া যাবে। তাঁকে এখন থেকে কলপ, দাড়িতে খেজাব আর চোখে সুর্মা লাগানো অভ্যেস করতে বলবি কিন্তু কন্যা পক্ষের কিন্তু একটা কথা ভাই, দেখিস সোনা বরের যেন ঐ সেই বাঁকড়োর শুকলাল বুড়োর মত (মনে আছে তাকে ?) য্যা এক কুলো দাড়ি না থাকে। মা গো মা। সে যে আমার মাথার চুলের চেয়েও বড় রে। বুড়ো চ'লেছে তো চলেছে, যেন রাজসভার বন্দিনী চামর ঢুলোতে ঢুলোতে চ'লেছে। এত ব'লছি তার কারণ দাড়ির ঐ জটিস জটিলতার মধ্যে হাত মুখ জড়িয়ে গেলে একেবারে জবড় জং আর কি, নড়ন চড়ন নাস্তি !

দাঁড়া, আগে আমার নিজের রামপটের আরো একটু না ব'ললে আর মনের উৎপুতোনি মিটছে না। এইটে বলে বাকি দরকারী কথা ক'টা সেরে ফেলতে হবে। কেন না, এরই মধ্যে প্রায় ন'টা বেজে গেল! যদিও আমি গল্প উপন্যাস লিখে থাকি, কিন্তু আমার এই প্রিয়জনদের চিঠি লেখবার সময় আর কিছুতেই সব কথা বেশ গোছালো ক'রে লিখিতে পারিনে। সব কেমন এলোমেলো হ'য়ে যায়। কিন্তু তা যেন অন্তত আমার কাছে তাই বেশ মিষ্টি লাগে। এতে কেরদানি ক'রে লেখবার চেয়ে যে আগল প্রাণটুকুর---সত্যের সত্য মিথ্যা ধরা পড়ে যায়। এই জন্যে খুব বেশি ভাবাবেগ থাকা আমার বিবেচনায় খারাপের চেয়ে ভালোই বেশি। তা ছাড়া, এতে লাগাম ছাড়া ঘোড়ার (যেমন তোদের নুরুল হুদা বাঁধন-হারা) মতন একটা বন্ধনহীন উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ বেশ গাড় ক'রে উপভোগ করা যায়। এ আনন্দ কিন্তু বন্ধন দশাপ্রাপ্ত বেচারীদের কাছে একটা অনাসৃষ্টি চক্ষুশূলের মতই বাজবে। আহা, এ বেচারাদের প্রাণে যে আনন্দই নেই, তা তারা আনন্দের মুক্তির মাধুর্য্য বুঝবে কি ক'রে? একটু সাংসারিক সামান্য মামুলী সুখের মায়াতেই এরা মনে ভাবে, কেমন এই তো আনন্দ! সেই দাড়ি ওয়ালা রাজার দাড়িতে তেঁতুল গুড় লাগিয়ে সেই দাড়ি চুষে' আম খাওয়ার স্বাদ বোঝা আর কি!...যাক সে সব কথা আমরা তো আর জোর ক'রে মরা লোককে বাঁচাতে পারবো না। যার প্রাণে আনন্দই নেই তাকে বুঝাবো কি দু চুলের ছাই আর পাঁশ?

দেখলি? কি ব'লতে গিয়ে ছাই ভুলেই গেলাম। যাক গে।...

আমার পরম স্নেহের পাগল পথিক ভাই নুরুকে নিয়ে যখন আমায় খোঁচাই দিয়েছিস রেবা, তখন তার দিক হ'য়ে আমায় রীতিমত ওকালতী বাকযুদ্ধ (দরকার হ'লে মল্লযুদ্ধও অসম্ভব নয়!) ক'রতে হবে দেখছি তোর সঙ্গে কেন না, আমিই এখন এ স্নেহ-হারার বড় বোন, আর সে হিসাবে তুই আমার ভাই-এর ভাবী অর্থাৎ কিনা আমার ভা'জ! অতএব আমি তো ননদিনী। তবে আয় একবার ননদ ভাজে বেশ ক'রে একটা কাজিয়া কোঁদল পাকানো যাক, একেবারে কাহারবা বাজার মত জোর! আমি এই আমার আঁচলপ্রান্ত কোমরে জড়ালাম! তুইও তবে তোর মালসা খ্যাঙরা নিয়ে ব'স।

সর্বপ্রথম পাগল নুরুর কাণ্ড কারখানা নিয়ে তোর এত রাগ হওয়া ভয়ানক অন্যায়। যে বাঁধন নেবে না, তাকে জোর ক'রে বাঁধতে গিয়েছিলি, সে কখনো সম্ভব হয় রে বোন? পাগলা হাতী আর উদ্‌মো ষাঁড়কে জিঞ্জির বা দড়াদড়ি দিয়ে বাঁধলে হয় তারা বাঁধন ছিঁড়বে, নয় আছাড় খেয়ে ম'রে বন্ধনমুক্ত হবেই হবে।

আর যদিই ব্যতিক্রম স্বরূপ বেঁচে যায়, তবে সে হচ্ছে জীয়ন্তে মরা। মুক্ত আকাশের পাখীকে সোনার শিকল, মণি মাণিক্যের দাঁড়, দুধ ছোলা দেখিয়ে হয় তো প্রলুব্ধ করা গেলেও যেতে পারে, কিন্তু তাকে কেউ ভয় দেখিয়ে হয় তো পারবে না। সেও অমনি ক'রে বন্ধনমুক্ত হবেই! যার রক্তে রক্তে বাঁধন হারার ব্যাকুল ছায়ানটের নৃত্য চপলতা আর শিরায় শিরায় পূর্ণ তেজে নট নারায়ন রাগের ছন্দ মাতন হিন্দোল দোল দিচ্ছে, তাকে থামাতে যাওয়া মানেই হ'চ্ছে, তার ঐ নৃত্য চপলতা আর হিন্দোল দোল আরো আকুল চঞ্চলতা জাগিয়ে দেওয়া আরো বিপুল দোল উন্মাদনায় দুলিয়ে দেওয়া! তুই ওকে ঘুম পাড়িয়ে শান্ত ক'রতিস? হাসি পায় তোর ছেলেমানুষী কথা শুনে! আগ্নেয় পর্বত দু-চার দিন শান্ত থাকিলেও তার বুকের আগুন-দরিয়া যাবে কোথায়? আমরা বাইরে থেকে তাকে শান্ত ভেবে খুব চাল চালতে পারি তার ওপরে, কিন্তু এটা যে আমরা ভুলে যাই, যে তার বুকের অগ্নি-সিন্ধুতে অনবরত উর্মিলীলার তাণ্ডব নাচ চ'লেছে ঐ তুঙ্গ তরঙ্গ গতির সমস্ত শক্তি জ'মে জ'মে এক বার যখন হু হু করে আগুনে প্রতাপ ফোয়ারা ছোটে, তখন আমরা গালে হাত দিয়ে ভাবি,—ইস্ হ'ল কি! নয়? আমি তো তোকে হাজার বার মানা ক'রেছিলাম যে, মিছে বোন এ ক্ষ্যাপাকে গারদে পুরবার চেষ্টা, এ হ'চ্ছে বিশ্ব মাঠে দেওয়া চির-মুক্তের দাগা উদ্‌মো ষাঁড়! গরীবের কথা বাসি হলে ফলে। আমার বুক ভরা বেদনা ঝঞ্ঝা এনে এই বাঁধন হারার ব্যথার প্রশান্ত মহাসাগরে দুরন্ত-সংঘাত আর কল-কল্লোল জাগিয়ে দেওয়ার যে বদনাম তুই আমার ওপর দিয়েছিস, তা সত্য হলে আমি সগৌরবেই সায় দিতাম। কিন্তু আদতে যে সেটা ভুল বোন। এ ঘর ছাড়া পাগলের দলকে কে যে কোন চিরব্যথার বনে থেকে ঘর-ছাড়া ডাক ডাকছে, তা আমিও ব'লতে পারবো না, তুইও পারবিনে, এমন কি ঐ ঘর ছাড়া পাগল নিজেই ব'লতে পারবে না! সে তো আজকের গৃহ-হারা নয় রে রেবা, সে যে চির উদাসী চিরবৈরাগী! সৃষ্টির আদিম দিনে এরা সেই যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে, আর তারা ঘর বাঁধলো না। ঘর দেখেলেই এরা বন্ধন-ভীতু চখা হরিণের মতন চমকে ওঠে! এদের চপল চাওয়ায় সদাই তাই ধরা প'ড়বার বিজুলি-গতি ভীতি নেচে বেড়াচ্ছে। এরা সদাই কান খাড়া ক'রে আছে কোথায় কোন গহন-পারের বাঁশী যেন এরা শুনছে আর শুনছে। যখন সবাই শোনে মিলনের আনন্দরাগ, এরা এখন শোনে বিদায়বাঁশির করুণ গুঞ্জরণ! এরা ঘরে বারে বারে কাঁদন নিয়ে আসছে আবার বারে বারে বাঁধন কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে। ঘরের ব্যাকুল বাহু এদের বুকে ধরেও রাখতে পারে না। এরা এমনি ক'রে চিরদিনই ঘর পেয়ে ঘরকে হারাবে আর যত পরকে ঘর ক'রে নেবে!

এরা বিশ্বমাতার বড় স্নেহের দুলাল, তাঁর বিকেলের মাঠের বাউল-গায়ক চারণ-কবি যে এরা! এদের যাকে আমরা ব্যথা ব'লে ভাবি, হয় তো তা ভুল! এ ক্ষ্যাপার কোনটা যে আনন্দ কোনটা যে ব্যথা তাই যে চেনা দায়! এরা সারা বিশ্বকে ভালবাসছে, কিন্তু হায়, তবু ভালবাসার ক্ষুধা বেড়েই চ'লেছে, তাই এরা অতি সহজেই স্নেহের ডাকে গা ঘেঁসে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু স্নেহকে আজো বিশ্বাস ক'রতে পারলো না এরা। তার কারণ ঐ বন্ধন-ভয়! এদের ভালবাসা এত বিপুল আর এত বিরাট যে, হয় তো তোরা তাকে উন্মাদের লক্ষণ ব'লেই ভাবিস। ···দুর্ব্বার আর অগ্নির কথা? আগুন যদি না থাকবে, তবে এদের চলায় এমন দুর্ব্বার গতি এলো কি ক'রে? এরাই পতঙ্গ, এরাই আগুন। এরাই আগুন জ্বালে, এরাই পুড়ে মরে। আগুন তো এদের খেলার জিনিস! আগুনে এ যে কতবার পুড়বে কতবার বেরিয়ে আসেবে, তা তুই তো জানিসনে, আমিও জানিনে!

তোর সহজ বুদ্ধি দিয়ে তুই সহজভাবে নুরুকে যে রকমভাবে বুঝে আমায় চিঠিতে লিখেচিস, তা দু-এক জায়গা ছাড়া খুবই সত্যি। হয় তো আমার ভুল হ'তে পারে বুঝবার, তবে কিনা, তোদের সংসারী লোকের চেয়ে সংসারের বাইরে থেকে নানান ব্যথা-বেদনার মধ্যে দিয়ে আমরা মানব-চরিত্র বা মানুষের মন বেশী ক'রে বুঝি আর সেই হিসাবেই আমি এই বাঁধন-হারাদের সম্বন্ধে এত কিছু মনস্তত্ত্ব বা দর্শন লিখে জানালাম তোকে।

নুরুকে স্রষ্টার বিদ্রোহী ব'লে তোর ভয় হ'য়েছে বা দুঃখ হ'য়েছে দেখে আমি তো আর হেসে বাঁচিনে লো! নুরুটাও গঁষ্টার বিদ্রোহী হ'ল, আর অমনি স্রষ্টার সৃষ্টিটাও তার হাতে এসে প'ড়লো আর কি!···এখন ওর কাঁচা বয়সে, গায়ের আর মনের দুইএরই শক্তি যথেষ্ট, তার শরীরে উদাম উন্মাদ যৌবনের রক্তহিল্লোল বা খুন-জোশী তীব্র উষ্ণ গতিতে ছুটাছুটি ক'রছে, তার ওপর আবার এই স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল বাঁধন-হারা সে—অতএব এখন রক্তের তেজে আর গরমে সে কত আরো অসম্ভব সৃষ্টি-ছাড়া কথাই ব'লবে! এখন সে হয়তো অনেক কথা বুঝেই বলে; আবার অনেক কথা না বুঝে শুধু ভাবের উচ্ছ্বাসেই ব'লে ফেলে! একটা বলবান জোয়ান ষাঁড় যখন রাস্তা দিয়ে চলে, তখন খামাখাই সে কত দেওয়ালকে কত গাছকে ঢুঁস দিয়ে বেড়ায় দেখেছিস তো? এটা ভুলিসনে যেন রেবা যে, এ ছেলে বাঙলাতে জন্ম নিলেও বেদুঈনদের দুরন্ত মুক্তি-পাগলামি, আরবীদের মস্ত পোর্দা আর তুর্কীদের রক্ত-তৃষা ভীম স্রোতাবেগের মত ছুটছে এর ধমনীতে ধমনীতে। অতএব এ সব ছেলেকে বুঝতে হ'লে এদের আদত্য সত্য কোনখানে, সেইটেই সকলের আগে

খুঁজে বের ক'রতে হবে। এত বড় যে ধর্ম্ম, তারও তো সামাজিক সত্য, লৌকিক সত্য, সাময়িক সত্য ইত্যাদি ইত্যাদি কত রকমের না বাইরের খোলস মুখোশ র'য়েছে, তাই ব'লে কি এই সব অনিত্য সত্যকে ধর্ম্মের চিরন্তন সত্য ব'লে ধরতে হবে? অবিশ্যি সত্য কখনো অনিত্য বা নৈমিত্তিক হ'তে পারে না, শুধু কথাটা বোঝবার জন্যে আমাকে ওরকম ক'রে ব'লতে হ'ল। প্রত্যেক ধর্ম্মই—সত্য—শাশ্বত সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত এবং কোন ধর্ম্মকে বিচার ক'রতে গেলে তার এই মানুষের গড়া বাইরের বিধান-শৃঙ্খলা দিয়ে কখনো বিচার কর'বো না; আর তা করতে গেলে কাণার হাতী দেখার মতই ঠ'কতে হবে। তেমনি মানুষকে—তার চির অমর আত্মাকে—তার সত্যকে বুঝতে হ'লে তার অন্তর-দেউলে প্রবেশ ক'রতে হবে ভাই! আর বাইরের মিথ্যা আচার ব্যবহারকে সত্য ব'লে ধ'রব কেন?

হয় তো আমি কথাগুলো বেশ গুছিয়ে ব'লতে পারছিনে, আর পারবোও না কেন না, আমার মনের সে শান্ত ধৈর্য নেই। মন শুধু বাইরে বাইরে ছুটে বেরাচ্চে। তবে এরই মধ্যে আমার ব'লবার আসল সত্যটুকু খুঁজে বের ক'রে নিস্। হাঁ আসল মানুষটাকে বুঝতে হ'লে অবশ্যি তার এই আচার-ব্যবহার-গুলোকেই প্রথমে ঘেঁটে দেখতে হবে। কিন্তু এ ঘেঁটে সব সময় মুক্তি পাওয়া যায় না' অনেক সময় কাদা ঘাঁটাই সার হয়। যাক্, তা হ'লেও মানুষ মাত্রেরই নানান ভুল-ভ্রান্তি আছে, দোষ-গুন নিয়েই মানুষ। যারা এই সব 'স্রষ্টার বিদ্রোহী' তরুণদের গালি দেয়, তারই বা 'স্রষ্টার রাজভক্ত' প্রজা হ'য়ে সে স্রষ্টা-রাজা সম্বন্ধে কোন খবরাখবর রাখে কি? আর পাঁচ জনের মতন শুধু চোখ বুঁজে অন্ধ বিশ্বাসে অন্ধের মতন হাতড়িয়ে বেড়ানোতেই কি সে অনাদি অনন্ত সত্যকে তারা পাবে যারা এই রকম বিদ্রোহীদের নাস্তিক ইত্যাদি ব'লে দাঁত মুখ খিঁচিয়েতাড়া করে, তারা আস্তিক হ'য়েই সে পরম পুরুষের কতটুকু খবর রাখে? তাঁর খবর রাখা তাঁকে ভাবা তো অন্য কথা, তাঁকে—সত্যকে যে অহরহ এই আস্তিকের দল প্রতারণা ক'রছে, এ ভণ্ডামী কি তারানিজেও বোঝে না? মন্দিরে গিয়ে পুজা করা আর মসজিদে গিয়ে নমাজ পড়াটাই কি ধর্ম্মের সার সত্য? এগুলো তো বাইরের বিধি। কিন্তু এ-গুলোকেই কি তারা ভাল ক'রে মেনে চ'লতে পারে? মন্দিরে গিয়ে দেবতার সামনে মুখস্ত মন্ত্র আওড়ায় কিন্তু মন থাকে তার লোকের সর্ব্বনাশের দিকে! মসজিদে গিয়ে নমাজের 'নিয়ত্' করেই ভাবে যত সংসারের পাপ দুশ্চিন্তা! এই ভণ্ডামী, এই প্রতারণাই তো এদেরসত্য! অতএব এদের মত এমনি ক'রে আত্মাকে বিনাশ না ক'রে তাদেরই একজন যদি সত্যকে পাবার জন্যে

নিজের নতুন পথ কেটে নেয়, তবে এরা লাঠি সোঁটা নিয়ে যে তাকে তাড়া ক'রবেই, —নিতান্ত নির্বীর্য্যের মত ! একজন সত্যান্বেষী বিদ্রোহীকে তাড়া করবার মত শক্তি এ মিথ্যুক ভণ্ডদের যে বিলকুল নাস্তি! ও কেবল ভীত সারমেয়ের দাঁত-খিঁচুনী মাত্র। এরা যে মিথ্যাকে প্রতারণাকে কেন্দ্র ক'রেই আত্মাকে ক্রমে নীচের দিকে ঠেলেছে তা এরা বুঝলেও কিছুতেই স্বীকার ক'রবে না ! সত্যকে স্বীকার ক'রবার মত সাহসই যদি থাকবে, তবে এদের এমন দুর্দ্দশাই বা হবে কেন? মনসুর যখন বিশ্বের ভণ্ড মিথ্যুকদের মাথায় পা রেখে ব'লেছিল,—"আনাল্ হক"—আমিই সত্য—সোহহম, তখন যে-সব বক ধার্ম্মিক তাঁকে মারবার জন্যে হৈ-হৈ-রৈ-রৈ ক'রে ছুটেছিল, এ লোকগুলো যে তাদেরই বংশধর। এ মিথ্যাধর্ম্মিকের দলই তো সে দিনে ঐ মহর্ষি মনসুরের কথা তাঁর সত্য বুঝতে পারেনি, আজও পারছে না আর পরেও পারবে না ; এদের এই রকম একটা দল থাকবেই কিন্তু যারা সত্যকে পেতে চ'লেছে, যাদের লক্ষ্য সত্য, যারা সত্যের হাত-ছানি দেখেছে তাদের এইসব শক্তিহীন হীনবীর্য্য লোকে কি থামাতে পারে ? সত্য যে চিরবিজয়ের মন্দারমালা গলায় প'রে শান্ত সুন্দর হাসি হাসবে। তা ছাড়া, বিদ্রোহী হওয়াও তো একটা মস্ত শক্তির কথা। লক্ষ লক্ষ লোক যে জিনিসটাকে সত্য ব'লে ধ'রে রেখে দিয়েছে চিরদিন তারা যে পথ ধ'রে চ'লেছে, তাকে মিথ্যা ব'লে-ভুল ব'লে তাদের মুখের সামনে বুকফুলিয়ে যে দাঁড়াতে পারে, তার সত্য নিশ্চয়ই এই গতানুগতিক পথের পথিকদের চেয়ে বড়। এই বিদ্রোহীর মনে এমন কোন শক্তি মাথা তুলে প্রদীপ্ত চাওয়া চাইছে যার সঙ্কেতে সে যুগযুগান্তর সমাজ, ধর্ম্ম, শৃঙ্খলা, সব-কিছুকে গা ধাক্কা দিয়ে নিজের জন্যে আলাদা পথ তৈরী ক'রে নিচ্ছে ! কই, হাজারের মধ্যে আর নয়'শ নিরানব্বই জন তো এমন ক'রে দাঁড়াতে পারে না ? তুই কি বলিস, এই নয়'শ নিরানব্বই জনই তা হলে সত্যকে পেয়ে ব'সে আছে ? যে মরণকে ধ্বংসকে পরোয়ানা ক'রে না-চলার পথ দিয়ে চলে, কত বড় দুর্জ্জয় সাহস তার ? আর সত্যের শক্তি অন্তরে না থাকলে তো সাহস আসে না। তা ছাড়া, প্রত্যেক আত্মারও তো একটা স্বতন্ত্র গতি আছে আর সকলের মত এক জন গড্ডালিকা প্রবাহে যদি না চলে, তা ব'লে তার পথ ভুল ? বিশেষ ক'রে বিদ্রোহী হবার যেমন শক্তি থাকা চাই, তেমনি অধিকার ও থাকা চাই। কই, আমি তো বিদ্রোহী হ'তে পারিনে, তুমি তো হ'তে পার না ; আমাদের মাঝে যে সে বিপুল সহ্য-শক্তি নেই। বিদ্রোহীটা তো অভিমান আর ক্রোধেরই রূপান্তর। ছেলে যদি রেগে বাপকে বাপ না বলে, বা মা'কে মা না বলে, কিংবা বলে যে এরা তার বাপ মা নয়, তা হ'লে কি সত্যি-সত্যিই তার পিতার পিতৃত্ব, মাতার মাতৃত্ব মিথ্যা হ'য়ে যায় ? যে ক্ষুব্ধ অভিমান তার

বুকে জাগে, তার শেষ হ'লেই মায়ের ক্ষ্যাপা ছেলে ফের মায়ের কোলেই কেঁদে লুটিয়ে পড়ে! কিন্তু এই যে অভিমান, এই যে আক্রোশের অস্বীকার তা দিয়ে হয় কি ?—না, সে তার বাপ-মাকে আরো বড় ক'রে চেনে, বড় করে পায় এই রকম ক'রে হঠাৎ একদিন চিরন্তনী মাকেও হয়তো তার পক্ষে পাওয়া বিচিত্র নয়। তা ছাড়া, তার যে অধিকার আছে এই অভিমান ক'রবার, এই বিদ্রোহী হবার, কেন না, সে তার মায়ের স্নেহটাকে এত নিবিড় করে পেয়েছে যা দিয়ে সে জানে যে সমস্ত বিদ্রোহ সমস্ত অপরাধ মা ক্ষমা করবেনই! যে স্নেহে যে ভালবাসায় অভিমান জাগতে পারে—রাগ জন্মাতে পারে, সে স্নেহ-ভালবাসা কত বড় উচ্চ একবার ভাব দেখি! এতে মার অপমান না হয়ে তাঁকে যে আরো বড় করে দেওয়া হয় রে! তাই মা ঝোঁক নেওয়া ক্ষ্যাপা ছেলের ঝোঁক নেওয়া দেখে ছেলের হাতের মার খেয়েও গভীর স্নেহে চেয়ে চেয়ে হাসেন! এ দৃশ্য ব'লে বোঝবার নয়। ছেলের হাতের এ মার খাওয়াতেও যে মায়ের কত আনন্দ কত মাধুরী তা তো বাইরের লোকে বুঝতে পারে না। তারা মনে করে কি বদ্‌মায়েশ দুরন্ত ছেলে বাবা! কিন্তু যে ছেলে মায়ের এত স্নেহ পায়নি, এমন অধিকার পায়নি, সে মাকে মারা তো দূরের কথা, তাঁর কাছে ভাল করে কাছ ঘেঁষে একটা আবদারও করতে পারে না!···তাই প্রথমেই বলেছিলাম যে এই বাঁধন-হারা নুর যেন বিশ্বমাতার বড় স্নেহের দুলাল—ঠিক 'কোল-পোঁছা' ছেলের মতন আবদেরে' একজিদ্দে একরোখা—আর তোদের কথায় বিদ্রোহী! অনেক ছেলে ম'রে ম'রে যাবার পর যে এই ক্ষ্যাপায় মায়ের মড়াচে ঝোঁকদার ছেলে। দেখবি, এ-শিশু আবার হাসতে হাসতে মায়ের স্তন্য—ক্ষীর পান করছে আর আপন মনেই খেলেছে।...মা যখন তাঁর দুষ্ট ছেলেকে স্নান করবার সময় সাবান দিয়ে তোয়ালে দিয়ে ঘসে ঘসে পরিস্কার করেন, তখন তার কান্না আর রাগ দেখেছিস তো? সে তখন হাতে দাঁতে মায়ের চুল ছিঁড়তে থাকে, কিল-চাপড় বর্ষণ করতে থাকে আর চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে ফেলে! মা কিন্তু হাসতে হাসতে তাঁর কাজ করে জান। তাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে পরিষ্কার ধুতিটি পরিয়ে দিয়ে চোখে কাজল কপালে টিপটি দিয়ে যখন মুখে ঘন ঘন চুমো খান, তখন আবার সেই দুরন্ত ছেলের প্রাণ-ভরা হাসি দেখেচিস? নুরুটারও এখন হয়েছে তাই। বিশ্ব-মাতা এখন তাকে ধুয়ে মুছে রগড়ে সাফ করে নিচ্ছেন, আর সেও তাই এই হাত-পা ছুঁড়ে কান্না ও মারজুড়ে দিয়েছে। মা যেদিন কোলে নিয়ে চুমো খাবেন, সিদিন কোথায় থাকবে ওর ওই ভূতোমী আর কোথায় থাকবে এই কান্না আর লাফালাফি! তখন সব সুন্দর—সুন্দর! এ শুভ দিন তার জীবনে জাগ্‌বেই ভাই দেখেনিস তুই। তবে তার হয়তো এখনো অনেক দেরি। তার

জীবনে সত্য রয়েছে, তবে রুদ্র মূর্ত্তিতে ! এর পরেই যখন কল্যাণ জাগবে জীবনে, তখন দেখবি সব সুন্দর হয়ে গিয়েছে ! ছেড়ে দে বোন, ওকে ছেড়ে দে ! চলুক ও নিজের এক রোখা পথ দিয়ে—কল্যাণকে আপনিই ও খুঁজে নেবে ! কল্যাণ নিজেই ওর পিছু পিছু মালা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সময় বুঝলেই সে এই পাগলার গলায় মালা দিয়ে ওকে ভুজ-বন্ধনে বেঁধে ফেলবে। তুই লাল কালিতে ডগডগে করে লিখে রেখে দে এই কথা। আমি জানি আমার এ ভবিষ্যদ্বাণী ফলবেই ফলবে, যদিও আমি পয়গম্বর নই !

হাঁ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার আর একটু বলবার আছে। আমি তো পূর্ব্বেই বলেছি যে সব ধর্ম্মেরই ভিত্তি চিরন্তন সত্যের পর—যে সত্য সৃষ্টির আদিতে ছিল, এখনো রয়েছে এবং অন্ততেও থাকবে। এই সত্যটাকে যখন মানি, তখন আমাকে যে ধর্ম্মে ইচ্ছা ফেলতে পারিস। আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি খৃষ্টান, আমি বৌদ্ধ, আমি ব্রাহ্ম। আমি তো কোনো ধর্ম্মের বাইরের (সাময়িক সত্যরূপ) খোলসটাকে ধরে নেই। গোঁড়া ধার্ম্মিকদের ভুল তো ঐখানেই। ধর্ম্মের আদত সত্যটা না ধরে এঁরা আছেন যত সব নৈমিত্তিক বিধি-বিধান। এরা নিজের ধর্ম্মের উপর এমনি অন্ধ অনুরক্ত যে কেউ এতটুকু নাড়া চাড়া পেলেও ফোঁস করে ছোবল মারতে ছোটেন। কিন্তু এতটুকু বোঝেন না তাঁরা যে তাঁদের 'ইমান' বা বিশ্বাস, তাঁদের ধর্ম্ম কত ছোট কত নীচ কত হীন, যে, তা একটা সামান্য লোকের এতটুকু আঁচড়ের ঘা সইতে পারে না। ধর্ম্ম কি কাঁচের ঠুনকো গ্লাস যে একটুতেই ভেঙে যাবে ? ধর্ম্ম যে ধর্ম্মেরই মতন সহ্যশীল, কিন্তু এ-সব বিড়াল-তপস্বীদের কাণ্ড দেখে তা কিছুতেই ম'নে ক'রতে পারিনে। তাঁদের বিশ্বাস তো ঐ এতটুকু বা সত্যের জোরও অমনি ক্ষুদ্র যে, তারসত্যাসত্য নিরূপণের জন্যে তোমায় আলাদা পথে যেতে দেওয়া তো দূরের কথা, তা নিয়ে একটা প্রশ্নও ক'রতে দেবেনা ! এই সব কারণেই, ভাই, আমি এই রকম ভণ্ড আস্তিকদের চেয়ে নাস্তিকদের বেশী পক্ষপাতী। তারা সত্যকে পায়নি ব'লে সোজা সেটা স্বীকার ক'রে ফেলে ব'লে বেচারাদের হয়েছে ঘা'ট ! অথচ তারা এই সত্যের স্বরূপ বুঝতে এই সত্যকে চিনতে এবং সত্যকে পেতে দিবারাত্তির প্রাণপণ চেষ্টা ক'রছে—এই তো সাধনা—এইতো পূজা, এই তো আরতি। এই জ্ঞান-পুষ্পের নৈবেদ্য চন্দন দিয়ে, এরা পূজা ক'রবে আর ক'রছে, তবু দেবতাকে অন্তরে পায়নি ব'লে মুক্তকণ্ঠে আবার স্বীকারও ক'রছে যে কই দেবতা ? কা'কে পূজা ক'রছি ? আহা ! কি সুন্দর সরল সহজ সত্য ! এদের ওপর ভক্তিতে আপনিই যে মাথা নুয়ে পড়ে। এরা যাই হোক, এরা তো মিথ্যুক নয়-এরা বিবেকের বিরুদ্ধে কথা বলে না—এরা যে

সত্যবাদী ! অতএব এরা সত্যকে পাবেই পাবে ; আজ না হয় কাল পাবে ! আর এই বেচারারা অন্ধ বিশ্বাসীর দল ? বেচারারা কিছু না পেয়েই পাওয়ার ভান ক'রে চোখ বুজে ব'সে আছে। অথচ এদের শুধোও, দেখবে দিব্যি নাকী কান্না কেঁদে লোক-দেখানো ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে ব'লবে,—অঁা হাঁ হাঁ !—মঁরি মঁরি—ঐ ঐ ঐ দেঁখিঁ তিঁনি !" মিথ্যার কি জঘন্য অভিনয় ধর্ম্মের নামে—সত্যের নামে ! ঘৃণায় আপনিই আমার মন কুঁচকে আসে। তাই তো আমি বলি যে, এই পথ হারানোটা পথ খুঁজে পাওয়ারই রূপান্তর। তবে যা-কিছু বুঝবার ভুল। গুরুদেব সত্যি-সত্যিই গেয়েছেন,—

"ভাগ্যে আমি পথ হারালেম পথের মধ্যখানে !"

—কোটি কোটি নমস্কার ক'রছি এই মহাঋষির শ্রীচরণারবিন্দে এইখানে ! যাক্, এসব আলোচনা আপাতত এই খানেই ধামা চাপা দিলাম। এই কেঁচো উস্‌কাতে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ার ভয়েই বোন আমি মনে করি এ সব আলোচনা আর ক'রব না ; কিন্তু স্বভাব যায় না ম'লে ! বাপমায়ে বুঝেই যে আমার সাহসিকা নাম দিয়েছিলেন ; তা আমিও আজ যেন বুঝতে পারছি। তোর চিঠি পেয়ে আমার মনে যে ভাবের উচ্ছ্বাস বা স্থষ্টির বেদনা জেগেছিল, তার দরুণই হয় তো এত কথা লিখে ফেললাম। যতক্ষণ এই ভাবাবেগ আছে ততক্ষণই লিখতে পারবো, তারপর আর নয়। তাই "এই বেলা নে ঘর ছেয়ে" কথাটার উপদেশ স্মরণ ক'রেই যত পারছি লিখে চ'লেছি।

আমার বাচ্চা-সই মাহ্‌বুবা সম্বন্ধে যে ভয় ক'রেছিস তুই, তার কোন কারণ নেই। আমি তাকে খুব ভাল ক'রেই বুঝেছিলাম যে কয়দিন ছিলাম তার সঙ্গে। সে সহজিয়া। সে সহজেই ঐ ক্ষ্যাপাটাকে ভালবেসেছিল, আর এমনি সহজ হ'য়েই সে তাঁকে চিরজনম ভালবাসবে। তার বুকে যদি কখনো যৌবনের জল-তরঙ্গ ওঠে, তবে সে খুব ক্ষণস্থায়ী। যে সহজিয়া অতি সহজেই তার প্রিয়তমকে ভালবাসতে পারে, তার মত সুখী দুনিয়ায় আর কেউ নেই রে বোন। তার শান্তি, তার আনন্দ অনাবিল পূত, অনবদ্য,—একেবারে শিশির-ধোওয়া শিউলীর মত ! সে তার সমস্ত কিছু নৈবেদ্যের ডালি সাজিয়ে সেই যে এক মুহূর্ত্তেই তার পীতমের পায়ে শেষ একরেখা দীর্ঘশ্বাস আর আধ-ফোঁটা নয়ন-জলের সঙ্গে অঞ্জলি অঞ্জলি ক'রে ঢেলে দিয়েছে, তার পরে তার আর কোন দুঃখই নেই ! সে জেনেছে যে, সে সব পেয়েছে। সে জেনেছে যে সে প্রাণ ভ'রে দিয়েছে আর সে-দান দেবতাও বুক পেতে নিয়েছেন। সে জানে-খুব সহজভাবেই জানে—তার এতবুক-ভরা পবিত্র ফুলের দান, তার এমন সহজ পূজা ব্যর্থ হবার নয়। সহজ ভাবে দিতে জানলে যে অতি-বড় পাষাণ দেবতাও

সেখানে গ'লে যান, নিজেকে রিক্ত ক'রে সমস্ত কিছু ঐ সহজ পূজারীকে দান ক'রে ফেলেন। গুরুদেবের "কে নিবি গো কিনে আমাকে কে নিবি গো কিনে" শীর্ষক কবিতাটা প'ড়েছিস তো ? তাতে তিনি দিন-রাত তাঁর পসরা হেঁকে হেঁকে বেড়াচ্ছেন, —ওগো আমায় কে কিনে নেবে ? কত লোকই এল,—রাজা এলো; বীর এলো,—সুন্দরী এলো, কিন্তু হায় সকলেই ধীরে ধীরে গেল বন-ছায়ার দেশে। সকলেরই চোখের জল মিলিয়ে এল শেষে।" কিন্তু ধুলো নিয়ে খেলানিরত একটি ছোট্ট ন্যাংটা শিশু তুড়ং ক'রে লাফিয়ে উঠে তার কচি ছোট্ট দুটি হাত ভরিয়ে ধুলো-বালি নিয়ে ব'ললে—আমি তোমায় "অমনি কিনে নেব।" তখন কবিও তাঁর পসরা ঐখানে ঐ সহজিয়ার সহজ চাওয়ার কাছে বিনামুল্যে বিকিয়ে দিয়ে মুক্তি পেলেন। আমাদেরও নয়ন পাতা তখন এই সহজের আনন্দে আপনিই ভিজে ওঠে। এমনি সহজ করে চাওয়া চাই, এমনি সহজ হ'য়ে দেওয়া চাই রে বোন, আর তবেই যে পায় সেও বুক ভ'রে নেয়, যে দেয় তারও বুক ভ'রে যায়।...এই সহজ আনন্দে তার সমস্ত কিছু দিতে পেরেছে ব'লেই তো মাহবুবা আজ ছোট মেয়ে হ'য়েও নিখিল সন্ন্যাসিনীর চেয়ে বড়। তাই সে বৈরাগিনীও হ'ল না, সন্ন্যাসিনীও হ'ল না , ক্রুদ্ধা জননী যখন তাকে এক বুড়ো বরের হাতে সঁপে দিল, তখনো সে সহজেই তাতে সম্মতি দিল। এই সহজিয়ার কিন্তু এতে কোন দুঃখই নেই, সে যে জানে; যে তার যা দেবার তা অনেক আগেই যে নিবেদন হ'য়ে গিয়াছে। অর্ঘ্য নিবেদিত হ'য়ে যাওয়ার পর শূন্য সাজি বা থালাটা যে ইচ্ছা নিয়ে যাক, তাতে তার আসে যায় না। এই সহজিয়া পূজারিণীর দল যে আমাদের ঘরে ঘরে রয়েছে বোন, তবে আমাদের চোখ নেই, —আমরা দেখেও দেখি না এই নীরব পূজারিণীদের। এই সহজিয়া তপস্বিনীদের পায়ে আমি তাই হাজার হাজার সালাম ক'রছি এইখানে। আমাদের বুকে কিন্তু এই মূক মৌন সহজিয়াদের ব্যথাটাই চোখে পড়ে আর বুকে বেদনার মতই এসে বাজে। বাস্তবিক বোন, কি ক'রে এই হতভাগিনীদের (না, ভাগ্যবতী ?) বুক এমন সহজ সুখের নেশায় ভ'রে যায় ? এমন সর্ব্বস্বহারা হ'য়েও কি করে এত প্রাণ ঠাণ্ডা করা তৃপ্তির হাসি হাসে ? আমরা তা হাজার চেষ্টা ক'রলেও বুঝতে পারবো না ; কেন না, আগে যে অমনি সহজ হতে হবে ও বুঝতে হবে।... সেই জন্যেই বলছিলাম যে, মাহবুবার জন্যে কোন চিন্তা করিসনে ! সে আনন্দকে পেয়েছে, সে কল্যাণকে পেয়েছে,—সে মুক্তিও পেয়েছে এইখানে। কিন্তু সে এত বড় কথা হয় তো বুঝবেও না। আমরা যেটা বুঝি চেষ্টা-চরিত্তির করে সে সেটা সহজেই বুঝে নিয়েছে, এইখানেই তো সহজিয়ারা সহজ আনন্দে মুক্ত !

এই সহজিয়া মাহবুবা হয় তো সহজেই বন্ধনের মাঝে মুক্তি দিতে পারতো। কিন্তু কেন যে তা হ'লো না, সে একটা মস্ত প্রহেলিকা! আমি এখনো এর কিছুই বুঝতে পারছিনে। এইখানটাতেই নুরটাতে আর মাহ্‌বুবাটাতে যে একটা কোন গুপ্ত জটিলতা আছে, যেটার খেই আমি আজো পাচ্ছিনে। আর আমার মতন ওস্তাদ যেখানে হার মান্‌লে সেখানে তোর মতন চুনো-পুঁটির তো কর্ম্মই নয়। তবে এর নিগূঢ় মর্ম্ম আমি বের ক'রবোই করবো, এই ব'লে রাখলাম তোকে!

আমার বিশ্বাস, মহবুবাটা এই বাঁধন-হারাকে সইতে পারবে না ব'লে মিথ্যা ভয়ে তাকে মুক্তির নামে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে। অবশ্য এটা আমার আন্দাজ মাত্র। এটা না হওয়াই সম্ভব, কারণ যে মেয়ে সহজিয়া, তার ত এ ভয় হবার কারণ নেই!...দেখি, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

এক মাহ্‌বুবার মা বেচারীই রাক্ষুসী হবে কেন রেবা? এ-রকম রাক্ষুসী মা—যারা জেনে-শুনে মেয়েদের সর্বনাশ করে—তোদের সমাজে, হিন্দুর সমাজে এমন কি, আমাদের স্বাধীন সমাজেও তো কিছু আশ্চর্য নয় আর কমও নয়। এইতো সতীত্বনাশ! অবিশ্যি, সতীত্ব বলতে মনের না দেহের বোঝেন এরা, তা জানিনে; কিন্তু আমার কথায় সতীত্ব তো মনে। মনে মনে যাকে স্বামীত্বে বরণ ক'রলে মেয়ে, তা শুনেও তার কাছ থেকে ছিনিয়ে দু'টো মন্ত্র আউড়িয়ে জোর ক'রে এই বোবা মেয়েদের যে কসাই মা-বাপ হত্যা করে। তা হ'লে প্রকারান্তরে মা-বাপেরা মেয়ের সর্বনাশ কর্‌লে না কি? উল্টে আবার সম্প্রদানের সময় মেয়েকে সীতা সাবিত্রী হতে বলা হয়? কি ভণ্ডামী দেখেছিস্‌!

তোর শাশুড়ী সম্বন্ধে অভিমান ক'রে যে অভিযোগ করেছিস তা নেহাৎ অন্যায় হয়নি তোর পক্ষে। কেন না, সংসারের গিন্নীর এ-রকম ঝাল ঝাড়তে হয় মাঝে মাঝে। তবে যখন ঘরের গিন্নীও হ'য়েছিস লো, তখন ঘর-গেরোস্থালীর একটু ঝাঁজ সইতে হবে বই কি! এখনো তোর 'যৌবন' বয়স কিনা (অর্থাৎ ভোগের সময়!), তাই মাঝে মাঝে বিরক্তি আসে। তবে এও স'য়ে যাবে। জানিস তো, কাঁচা লঙ্কা গিন্নীদের বড্ডো প্রিয়! এ ঝাল না থাকলে সংসার মিষ্টিও লাগে না আর তাতে রুচিও হয় না।

তোর শাশুড়ী বেচারীর একেবারে সাদা সরল মন। সারা মনঃপ্রাণ তাঁর মায়ের স্নেহে ভেজা। এসব লোক সংসারে থেকেও চিরদিন একটু উদাসীন গোছের। সংসারের বাপ্পে ঝক্কি এঁরা নিমের রস গেলা করেই গেলেন। যেই দেখেন, আর একজনের হাতে এ-সব স'পে দিয়ে নিজে একটু আরামে নিঃশ্বাস

ফেলতে পারবেন অমনি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। তাইতো তোর হাতে সব কিছুর ভার সঁপে দিয়ে তিনি নিরিবিলির অত্যন্ত শান্তিতে ডুবতে চাইছেন। ওঁর খেলার সাথী এখন তোর কচি মেয়ে আনারকলি, কেন না, উনিও যে এখন তোর আর একটি নেহাৎ ঠাণ্ডা মেজাজের লক্ষ্মী মেয়ে আর সেই জন্যই তো তুই তাঁর লক্ষ্মী-মা। আহা, ওঁর এ শান্তিতে বাধা দিসনে বোন! এ তপশ্চারিণীর নীরব পূত তপোবনে গিয়ে গোলমাল ক'রে আর তার শান্তি ভাঙ্গিসনে। জানি ওঁর দুঃখ অনেক, আর তাইতেই তো তিনি এখন শান্তির ছায়া খুঁজছেন। বাড়ীতে থেকেও এসব লোকের অস্তিত্ব বোঝা যায় না, কিন্তু বাড়ীর সমস্ত শান্তি-টুকুকে ঘিরে র'য়েছেন এরাই, বিহগ-মাতার ডানার মত ক'রে।

এঁরা যখন চ'লে যান, তখনই বুঝতে পারি যে কি এক শূন্যতায় সারা সংসার ভ'রে উঠেছে।

হাঁরে, ভালো কথা! তুই এ চিঠিতে খুকীর কথা লিখিসনি যে বড়েজা? প্রথমে এটা আমার চোখে পড়েনি, কিন্তু শেষে জানতে পেরে হাজার বার তন্ন তন্ন ক'রে তোর চিঠি খুঁজেও আমার 'আনার কলি' মা'র নাম গন্ধও পেলাম না, আমার এতে কান্না পেয়ে গেল রাগে। আচ্ছা ভোলা মেয়ে তুই যা হোক লো! বোধ হয় মেয়েটাকে চিরদিন এমনি অনহেলাই ক'রবি, না? জানি, তুই তোর হাজার কাজের ওজন করবি! চুলোয় যাক্ তোর কাজ, এমন আনারকলির মতই এতটুকু ফুট ফুটে মেয়ে,— হায়, তাকে কখনো তোকে বুক ভ'রে সোহাগ করতে দেখলাম না। এ আমাদের বুকে বড় লাগে বোন। অমন মা হ'তে গিয়েছিলে কেন লো তবে মুখপুড়ী? "মা" আসবার আগেই হয় তো এই মা-কাঙ্গালী 'মেয়ে' এসে পৌঁচেছে। কিন্তু এখনো কি তোর মাঝে "মা" জাগ্‌লো না? না, হাতের কাছে পেয়েই এত অনহেলা? দেখ, তোর নাড়ীর মাঝে যে মা এখনো সুপ্ত! খুকীর বাবা রবিয়ল সাহেব পুরুষ হ'লেও তাঁর মাঝে সেই মা কি স্নেহময়ী মূর্ত্তিতে জাগ্রত! কিন্তু এই ছেলের জাত কি নিমকহারাম, সে যা পায় তাকে ছেড়ে দিয়ে যেটা পায় না সেইটাকেই পাবার জন্যে হাঁকুচপাঁকুচ্ করে! বাপের এত স্নেহ পেয়েও তাই সে যে বেশী ক'রেই তোর কোলের— মায়ের— কোলের—কাঙাল, তা তো আমি নিজে দেখেছি!

সত্যি ভাই, এ কচি মেয়েটাকে পেলে আমি যেন এখন বেঁচে যাই। আমি ওকে এখনই চাইতাম, কিন্তু দুষ্টু তুই হয় তো একটা বদ্‌মায়েসী বিদ্রূপ ক'রে বসবি ব'লে থেমে গেলাম। খুকী বড় হ'লে কিন্তু আমার কাছে এসে থাকবে আর লেখা-পড়া শিখ্‌বে ব'লে কথা দিয়েছিস মনে থাকে যেন।

শোফিটার অত্যাচারে তুই নাজেহাল হ'য়ে গিয়েছিস শুনে আমি আর হেসে বাঁচিনে। আচ্ছা জব্দ, না? ও জন্য হ'তেই বড্ডো বেশী আদর সোহাগ পেয়ে মানুষ হ'য়েছে কি-না, তাই এত দুরন্ত। তা হ'লে তোদের হারামের আইবুড়ো থুবড়ো মেয়ে কি ব'লতে পারতো "আমি বিয়ে করবো না, থুব্ড়ো থাকবো?" ও এখনো একেবারে ছেলে মানুষ তবে বিয়ে হবার পর বরের হাতে প'ড়ে হয়তো বাগ মানলেও মানতে পারে। ওর আদত ইচ্ছে কী জানিস্? ও নূরুটাকে বিয়ে ক'রতে চায়। আমায় একদিন কানে কানে ব'লে ফেলে আমার হাসি দেখে সে কি ভাই রাগ আর লজ্জা তার। কেঁদে কেঁটে তো একাকার-অথচ খামখাই! আমি আর হেসে বাঁচিনে। তারপর তাকে আশ্বাস দিয়ে ব'লেছি যে এ কথাটা কি আর আমি সবাইকে ব'লতে পারি রে, যে আমার ছোট বোন ভালবাসায় প'ড়ছেন। যতই হোক, আমি ত তার সাহসী দিদি, তবে তখন সে চুপ করে। দেখিস ভাই, তোর পায়ে পড়ি, তুই যেন এ কথা আবার ব'লে দিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিস্‌নে! এ পাগলা ছুঁড়িটার যৌবন কিন্তু বয়সের অনেক পেছনে প'ড়ে; হয় তো বিশ বছর বয়সে গিয়ে তবে কখনো ওর যুবতীর লজ্জা আসবে। তবে বিয়ে হ'য়ে গেলে আলাদা কথা। কেন না, তখন কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো হবে কি-না।

তোর খেলার সাথী বেচারার দুঃখে আমি এতটুকুও সহানুভূতি দেখাতে পাচ্ছিনে, কেন না তিনি এমন মূক না হ'য়ে গেলে কি আর তোর আমায় এখন মনে পড়তো রে ছুঁড়ি!

হাঁ, শোফির বিয়েতে যাবো বই কি! তা না হ'লে ওকে বাগ মানাবে কে? হয়তো বিয়ের সময়ই রেগে দোর দিয়েই ব'সে থাকবে। ওকে ব'লে দিস বোন যে, সে বিয়ে যদি নেহাৎই না করে, তবে আমার স্কুলের মেয়ে-দফ্‌তরী ক'রে দেওয়া যাবে। দেখিস, সে যেন ঠাট্টা মনে না করে। তা হ'লেই আমি হাবাৎ আর কি?

আমার বরের ভাবনা নিয়ে তোকে আর ভাবতে হবে না লো, তুই নিজের চরখায় তেল দে! "যার বিয়ে তার ধুম নেই, পাড়া পড়শীর ঘুম নেই!" যত দিন না আমার সন্ন্যাসী ঠাকুর আসবেন তত দিন আমায় সন্ন্যাসিনীই থাকতে হবে বই কি। সংসার না ডাকলে তো আর সংসারী হতে পারিনে নিজে সেধে! থাক্ আরো অনেক ব'লবার রইলো! খুকীকে চুমু দিস্। ইতি—

তোর সাহসী সই
সাহসিকা

শেওড়ান
১লা আষাঢ়
দুপুর রাত্তির

শ্রীচরণসরোজেষু

সাহসিকা-দি! বৈশাখ জৈষ্ঠ পেরিয়ে গেল। ঝড়ঝঞ্ঝা যত বইবার, বয়ে গেল আমার জীবনের ওপর দিয়ে। কিন্তু বৃষ্টি আজো থামেনি। আজ পয়লা আষাঢ়। আমার জীবনের এ আষাঢ় বুঝি আর ফুরোবে না। আশীর্ব্বাদ ক'রো দিদি, সত্যিই এ আষাঢ়ের যেন আর শেষ না হয়।

বিয়ের পর আর কাউকে চিঠি দিইনি। আমার এত শ্রদ্ধার মা দাদাভাই রবিয়ল সাহেব, এত ভালোবাসার ভাবী সাহেবা, শোফি—সকলের মাঝে যেন একটা মস্ত আড়াল প'ড়ে গেছে। আমি যেন কাউকেই আর ভাল ক'রে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। সব মুখ যেন ঝাপসা হয়ে আসছে—আমার মনেরমুকুরে দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়া লেগে! আজ আমার মনে হচ্ছে দিদি, যেন তুমি ছাড়া আমার আপনার বলতে কেউ নেই। শুধু তুমিই আমার মনে আজো ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠনি তাই আজ আমার মনের সকল দ্বন্দ্ব গ্লানি কাটিয়ে উঠে তোমার পানে সহজ চোখে চাইতে পারচি। তাই আবার বলছি সাহসিকা-দি, আজ তুমিই—একমাত্র তুমিই আমার গুরু, আমার বন্ধু, আমার সখি—সব! আজ আমি মনের কথা যেন মন খুলে বলতে পারি তোমার কাছে। আজ জেন আমি আত্ম প্রবঞ্চনা না করি!

আর আপনাকে ফাঁকি দিতে পারিনে দিদি! আজ আষাঢ়ের পুঞ্জীভূত মেঘের সাথে সাথে আমারও মন যেন ভেঙ্গে পড়ছে! মনে হচ্ছে মাটীর মত ক'রে আমায় কেউ চা'ক, আমিও আষাঢ় মেঘের মত নিঃশেষে নিজেকে ঝড়িয়ে দিই তার বুকে। নিজেকে জমিয়ে জমিয়ে যে ভার বিপুল ক'রে তুলেছি নিজেরই জীবনে, আজ আমি মুক্তি চাই সে ভার হ'তে। বিলিয়ে দেওয়ার সে সাধন কেমন করে আয়ত্ত করি ব'লে দিতে পার দিদি?

এই ত দুটো চোখ, ক'ফোঁটাই-বা জল ধরে ওতে! তবু মনে হচ্ছে আজ যেন আমি আষাঢ়ের মেঘকেও হা'র মানিয়ে দিতে পারি কেঁদে কেঁদে!

কত ঝঞ্ঝা, কত বজ্র, কত বিদ্যুতের পরিণতি এই বৃষ্টিধারা, এই চোখের জল! তুমি হয়ত মনে করছ আমি পাগল হয়েছি! তাও যদি হ'তে পারতাম

তা হলে নিজেকে ভোলার একটু অবসর মিলত। অবসরের চেয়েও বড় কথা দিদি এই স্ত্রী জাতির কর্ত্তব্যটা থেকে রেহাই মিলত একটু ! তুমি হয়ত অসন্তুষ্ট হচ্ছ এইবার, কিন্তু দশ আঙ্গুলের ক্ষুদ্র মুষ্টির চাপে এক মুঠো ফুলের দুর্দ্দশা দেখছ ? শুকিয়ে মরতে আমি রাজী আছি দিদি, কিন্তু এমন ক'রে কর্ত্তব্যের মুঠিতলে পিষ্ঠ হয়ে ম'রে নাম কিনবার সাধ আমার নেই। নারী-জীবনের ফুলহার নাকি বিধাতা প্রেমের গলায় দিবার জন্যই গেঁথেছিলেন, কবিতা তাই বলেন, কিন্তু মুঠিতলে পিশবার আদেশ যে শাস্ত্রকার দিয়েছিলেন তাঁকে যদি এই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মরবার সময় শ্রদ্ধা করতে নাই পারি --সেটা কি এতই দোষের !

বাঁচবার সাধ আমার ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু এমন করে জাঁতা-পেশা হয়ে মরবার প্রবৃত্তিও নেই আমার। মরতেই যদি হয় দিদি, তা হলে সে সময় কাছে আমার চাওয়ার ধনকে নাই পাই, অন্তত আমার চার পাশের দুয়ার জানালাগুলো যেন খোলা থাকে। প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেবার মত বায়ুর যেন সেদিন অভাব না হয়, এই ধরণী-মার মুখের পানে চেয়ে প্রাণ ভ'রে কেঁদে নেবার মত অবকাশ যেন সে দিন পাই দিদি, এইটুকু প্রার্থনা করো—শুধু আমার জন্য নয়—আমারই মত বাঙলার সকল কুলবধূর জন্য !

দেখছ ; নিজের দুঃখটাকেই ফেনাচ্ছি এতক্ষণ ধরে ; সুখের তলানিটার পরিমাণ করতে যেন ভুলে গেছি। আমার জীবনের পাত্র উপছে যেটা পড়ছে নিরন্তর—সেইটাই দেখলাম শুধু—নীচে জমা হয়ে রইল যা তা দেখবার সৌভাগ্য আমার হ'ল না—এ যে শুধু তুমিই ভাবছ তা নয়—আমিও ভেবেছি বহুদিন আজও ভাবি। কিন্তু দিদি তলানিটাকে যখন দেখি একটা চোখের যতটুকু জল ধরে তার চেয়েও কম, তখন সেটার ক্ষতিপূরণ করতে এই পোড়া চোখের জল ছাড়া আর কি থাকতে পারে—বলতে পার ?

আমার স্বামী দেবতা মানুষ। অর্থাৎ দেবতার যেমন ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই আবার লোভেরও ঘাটতি দেখিনে, তেমনি। তাঁর সম্বন্ধে অপবাদ আমি দেবো না, দিলে তোমরা ক্ষমা করবে না। ঐশ্বর্য্যে তাঁর আকর্ষণ যত বেশীই থাক অমৃত তার অরুচি নেই এবং ওটার জন্য আবদার হয়ত একটু অতিরিক্ত রকমেরই করেন ! আহা বেচারা ! দেখে দয়া হয় ! ছেলেবেলায় পড়েছিলাম,—সমুদ্র মন্থন চলেছে, ভাল ভাল জিনিস সব দেবতারা ভাগবাটোয়ারা ক'রে নিচ্ছেন, বেচারা দানব দৈত্যের দল বানরের পিঠে ভাগ করার সময় বেড়ালের মুখ যেমন হয়েছিল তেমনি মুখ করে দাঁড়িয়ে,—ক্রমে উঠলেন লক্ষ্মী, সুধার

ভাঁড় হাতে নিয়ে এবং তাঁকে অধিকার করে বসলেন বৈকুণ্ঠের ঠাকুরটী এতক্ষণ যদিই সয়েছিল—এইবার দেবতা দানব কারুরই সইল না। লাগল একটা গণ্ডগোল—এবং এই গণ্ডগোলের অবকাশে বৈকুণ্ঠের চতুর ঠাকুরটী লক্ষ্মী ঠাকুরুণকে নিয়ে একেবারে পগার পার। দ্বন্দ্ব যখন মিটল, তখন সুধার অংশ হয়ত সব দেবতাই পেলেন কিন্তু জিতে গেলেন যে ঠাকুরটী তিনি সুধাসমেত সুধাময়ীকে পেলেন—এ ব্যথা আমরা ভুললেও দেবতারা ভুললে না। তা আমার স্বামী দেবতাকে দেখেই অনুভব করছি। উনি যা বলেন, তার মনে ঐ রকমেরই কতকটা। ওঁর মাঝে আবার একটা দুষ্ট দানবও প্রবেশ করেছে—জানিনে কোন পথ দিয়ে ওঁর মাঝের দেবতা যখন অমৃতের জন্য অভিযোগ করেন নিরুদ্দেশ ঠাকুরটীর উদ্দেশে তখন দৈত্যটাও মুষ্টি পাকায় ক্রুদ্ধ রোষে, বোধ হয় বলে, পেতাম একবার এই হাতের কাছে। আমার স্বামী রসিক মানুষ, এই কথাটা তিনিও একদিন আমায় বলছিলেন—আফিমের নেশার ঝোঁকে। অবশ্য, তাঁর বলার ধরনটা ছিল অন্য ধরনের মোদ্দা মানে তার ঐ এক যে, সুধায় তিনি বঞ্চিত হলেন, তাঁর সুধাময়ীকে চোরে নিয়ে গেল!

সেদিন আমার মনটা হয়ত ভাল ছিল না, আমি বলেছিলাম কি দিদি জান? বলেছিলাম, সেই চোরটী যদি বৈকুণ্ঠের ঠাকুরটির কাছে একটু চাতুরালি শিখতেন তা হলে তাতে আজ জীবনে এত বড় ঠকতে হ'ত না। সে তা হলে সুধাময়ীকেও চাইত সুধার সাথে। স্বামী আফিমের নেশায় ঝিমোচ্ছিলেন, বোধ হয় বুঝতে পারেননি ভাল করে আমার হেঁয়ালি। বুঝলে আমার ভাগ্যে হয়ত এ দেব-লোক অক্ষয় না হলেও পারত।

স্বামী আফিম খেয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে বেঁচে গেছেন, আমারও এক একবার লোভ হয়, দিদি যে ঐ আফিমের অংশ নিয়ে আমিও চিরজন্মের মত বেঁচে যাই? যে-লোভটা ঐ উৎকট দিকটায় এতো ক'রে আকর্ষণ করে আমায়—সেই লোভটাই আবার মিষ্টি কোন ভবিষ্যতের পানে ইশারা হেনে বলে,—ওরে হতভাগী, বেঁচে থাক বেঁচে থাক তুই, সারা জীবনের ক্ষতি তোর এক মুহূর্তের কল্যাণে পুষ্পিত হয়ে উঠবে। তোর প্রতীক্ষার ধন ফিরে পাবি। তোর মৃত্যুক্ষণ হাসির রঙে রঙে উঠবে।—আমিও তার সাথে সাথে বলি, আমি বাঁচতে চাই বাঁচতে চাই যাকে আমি বাম হস্তের বারণ দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছি, দক্ষিণ হস্তের বরণ মালা দিয়ে যদি তার প্রায়শ্চিত না করি তা হলে আমার আর মুক্তি নেই ইহকালে।

আমার স্বামী আমার রূপকে চেয়েছিলেন রূপার দরে যাচাই করতে। শুনে খুশি হবে যে এ সওদায় তিনি ঠকেননি। কিন্তু এর জন্য স্বামীকে খোঁচা দিয়ে

লাভ নেই। এই ত আমাদের বাঙলার অন্তত শরীফ মুসলমান মেয়েদেও চিরকেলে একঘেয়ে কাহিনী। আমাদের সমাজের স্ত্রী-শিকারী অর্থাৎ স্বামীরা শব্দভেদী বান ছুঁড়ে শিকার করেন আমাদের। তাঁরা আমাদের দেখতে পান না বটে, কিন্তু শুনতে পান। রূপের একটা অভিশাপ আছে, হেরেমের দেয়াল ডিঙাতে তার বিশেষ বেগ পেতে হয় না। প্রভাত আলোর মত, ফুলের গন্ধের মত তার খ্যাতি ঘরে ঘরে দেশে দেশে পুরুষের কানে গিয়ে পৌছে। কোথাও ভাল শিকার আছে শুনলেই পুরুষ ছোটেন সেখানে, সেই শব্দভেদী বনানের কল্যাণে তাঁদের হয়ে যায় শাপে বর—কিন্তু এই হতভাগিনীদের বরই হয়ে ওঠে শাপ!

আমার স্বামী শিকার করে করে প্রধান হয়েছেন, হাত তাঁর পাকা লক্ষ্যও অব্যর্থ। কাজেই আমার রূপের খ্যাতি তাঁর কাছে পেঁছাবার পরেও তিনি চুপ করে বসে থাকবেন—তাঁর বীর চরিত্রে এত বড় অপবাদ দেবার সুযোগ তিনি দেননি। ছুঁড়লেন শব্দ লক্ষ করে বান, বানের রৌপ্যফলকে বিঁধে আমার বক্ষের অবস্থা যা-ই হোক, তাঁর মুখে হাসি যা ফুটল তা খাঁটি সোনার। এই খানে শুনে খুশি হবে দিদি তাঁর দাঁত সব সোনার। খোদার দেওয়া হাড়ের দাঁতের লজ্জা তিনি দূর করেছেন দাঁত খসে পড়তেই। এখন তিনি সোনার দাঁত বাঁধিয়ে নিয়েছেন! তাঁর দৌলত খাওয়া এবং বিবাহ করা দুই শখই অক্ষয় হয়ে গেল। বিজ্ঞানের জয়জয়কার হোক, আমাদের মত বহু হতভাগিনীর স্বামীর যৌবন এই বিজ্ঞানের কৃপায় অটুট হয়ে রইল!

আমার স্বামী জমিদার এ শুনে আমারই জাতের অনেক হতভাগীরই বুক চচ্চর করবে—সতীনের মত। কিন্তু আমার কপাল এমনই মন্দ দিদি যে, এই জমিদারী পক্ষ্মীরাজে চড়েও আমার দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা আর জাগল না কোনো দিন!

স্বামী নব নব অলঙ্কারে আমার বন্দনা করেন। কিন্তু প্রসন্ন যে হতে পারি না—এর ওষুধ কি!

অলঙ্কারে কাব্যদেবীর সুষমালক্ষ্মীর দাম বাড়ে, কিন্তু মাটির মানুষদের দাম ওতে বাড়ে না, কমে—বলে দিতে পার দিদি? হাটে যে বিকায় মাটির দরে, তাকে নিয়ে এ বিদ্রুপ কেন? হায় রে হতভাগিনী নারী, প্রাণের ডালা তার শূন্য রইল ব'লে দেহের ডালা সাজিয়ে সে হেসে বেড়ায়! অলঙ্কার সুন্দর, কিন্তু ও কঠিন বস্তু দিয়ে প্রাণের পিপাসা মেটে না। তা ছাড়া, পাষাণ বেদীর বুকে থাকতে হয় যাকে পড়ে তার গায়ে অলঙ্কার বড় বাজে দিদি। অলঙ্কার দিয়ে রূপ আমার খুলল কিন্তু মন কিছুতেই খুলল না, তাই বলেন আমার স্বামী।

অদ্ভুত এই মানুষের মন। যে মানুষ মানুষ খেয়ে খেয়ে এত মোটা হল, আজ সেই মানুষেই মানুষের একটুখানি করুণার জন্য কত কাঙাল হয়ে উঠেছে! দেখলে দুঃখ হয়! আমার স্বামী জমিদার, এটা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। জমিদার নামের পেছনে একটা কৌতূহল আছে। রাজার ওঁরা পাড়াগেঁয়ে সংস্করণ, তাই লোকের বিশ্বাস—কত না জানি রূপকথার সৃষ্টি হচ্ছে ওখানে। হয়ত বা হচ্ছেও! আমার স্বামী জমিদার একথা স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি ভোলেন না। তাঁর প্রতাপে দেশে যে ইংরেজ বলে কোনো এখনো শাসনকর্ত্তা আছে, একথা ভুলে গেছে তাঁর জমিদারী লোক। আর টাকাকড়ি? ইচ্ছা করলে আমায় বনবাস দিয়ে স্বর্ণসীতা পড়ে পাশে বসাতে পারেন! কত নারী তাঁকে আত্মদান করে ধন্য হয়ে বেহেশ্‌তে চলে গেছে হাসতে হাসতে। যাবার বেলায় তাদের এই সালঙ্কার জমিদার স্বামীর জন্য কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছে এই ভেবে, যে, কোন খপুড়ী আবার তাঁর এই ঐশ্বর্য্যের ওপর বসে তার প্রভুত্ব চালাবে! গয়না ও টাকা ছাড়া যে মেয়েলোক আরও কিছু চায়, এই নতুন জিনিসটার সঙ্গে যখন পরিচয় হ'ল তাঁর আমার কৃপায়, তখন এই হতভাগ্যের দুঃখ দেখে আমার মত পাষাণীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল! বলতে সে পারে না ঠিক প্রকাশ করে, কিন্তু তার মুখ দেখে আমার বুঝতে বাকি থাকে না—কি যন্ত্রণাই তার আজ হচ্ছে। আজ সে যেন বুঝেছে, জীবনে সব চেয়ে বড় পাওয়া যেটা, সেইটে থেকেই সে বঞ্চিত রয়ে গেল। অন্যের ভালবাসার যে কত দাম তা বুঝেছে বেচারা—যখন তার জীবন-প্রদীপের তৈল ফুরিয়ে এসেছে। সে আবার চায় যৌবন-ভিক্ষা—হয়ত সমস্ত ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও, সে তার সারা জীবনের ক্ষতিকে একদিনে আত্মদানে ভুলতে চায়, কিন্তু সব চেয়ে বেশী সে-ই জানে যে, তা আর হয় না। তবু সে আমার পায়ে পায়ে ঘুরে মরে; আমার রূপ তার গায়ে যে কখন কঠিন হয়ে বাজল জানি না, কিন্তু এ আমার বেশ স্মরণ আছে, যে সে এর জন্য প্রস্তুত ছিল না—এমনি একটা ভাব নিয়ে আমার দিকে পাগলের মত ক'রে সে একদিন চেয়েই ছিল। মনের যাদুস্পর্শে কোমল না হ'লে রূপ যে স্ত্রী-শিকারের বানের রৌপ্য ফলকের চেয়েও কঠিন হয়ে বাজে এ শিক্ষা তার সেদিন নতুন হ'ল। রূপা দিয়ে মানুষ যাচাই ক'রেও যে সব চেয়ে বড় ঠকা ঠক্‌তে হয় এ শিক্ষা হ'ল তার আমায় দিয়ে প্রথম। অলঙ্কার দিয়ে আমার ওজন করতে পারল না ব'লে—তার ঐশ্বর্য্যের স্বল্পতা ধরা প'ড়ল তার চোখে!

এখন সে ঐশ্বর্য্যকে পিছনে ফেলে নিজেকে অঞ্জলি ক'রে এনেছে আমার চরণতলে অর্পণ করতে, এইটাই আমার মনকে মাধুর্য্যে বেদনায় অভিভুত ক'রে

ফেলেছে। একটা দুর্দান্ত পশুকে জয় করার গৌরব কি কম! আমার যদি দেবার থাকত রূপ দেহ ছাড়া আর কিছু পুঁজি, সব দিতাম—এ বেচারার মৃত্যু পাণ্ডুর অধরে নিঙ্‌ড়ে! কিন্তু এ যা চায় তা আমি পাই কোথা দিদি? রাবণ রামের সীতাকে হরণ করেছিল এইটেই লোকে শিখে রেখেছে, কিন্তু সীতার রামকে নিয়ে দেশান্তরী হয়েছে এমনি একটা মহাকাব্য লিখবার বাল্মীকি কেউ নেই?

থাক, সোজা কথায় খেয়ে দেয়ে আমি দিব্বি মোটা হচ্ছি। দুটো বাঘে খেয়ে উঠতে পারে না—এমনি গতর হ'য়ে উঠেছে আমার। আমার কপাল ভাল, স্বামীর আমার কোনো পক্ষের কোনো পুত্রসন্তান নেই। অতএব আমি মুক্তপক্ষ। সেবা আদর যা-কিছু, স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে দেবার নেই।

তোমাদের খবর জানবার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছি, এই বুঝে যা হয় একটা বিহিত ক'রো।

আমার বোধ হয় আর বেশী চিঠি দেওয়া হবে না দিদি। মন একটা বিস্বাদ ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়্‌ছে দিন দিন, আর কিছু করতে—এমন কি চিঠি লিখতেও মন চায় না। রাত দিন রাজ্যের বই আনিয়ে পড়ি। খবরের কাগজে যুদ্ধের খবর পড়ি, মন আমার আরব সাগরের উপকূলে তরঙ্গের মত মাথা খুঁড়ে মরতে চায়।

আশীর্বাদ ক'রো দিদি, এই মাথাটা যেন কল্যাণের চরণতলে এইবার নোয়াতে পারি। ইতি—

হতভাগিনী
মাহ্‌বুবা

শেষ